সুখ ও শান্তিময় জীবন লাভের সচিত্র পথ-প্রদর্শক

# জ্ঞানামৃত

## প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যালয় -- কলকাতা - ২০

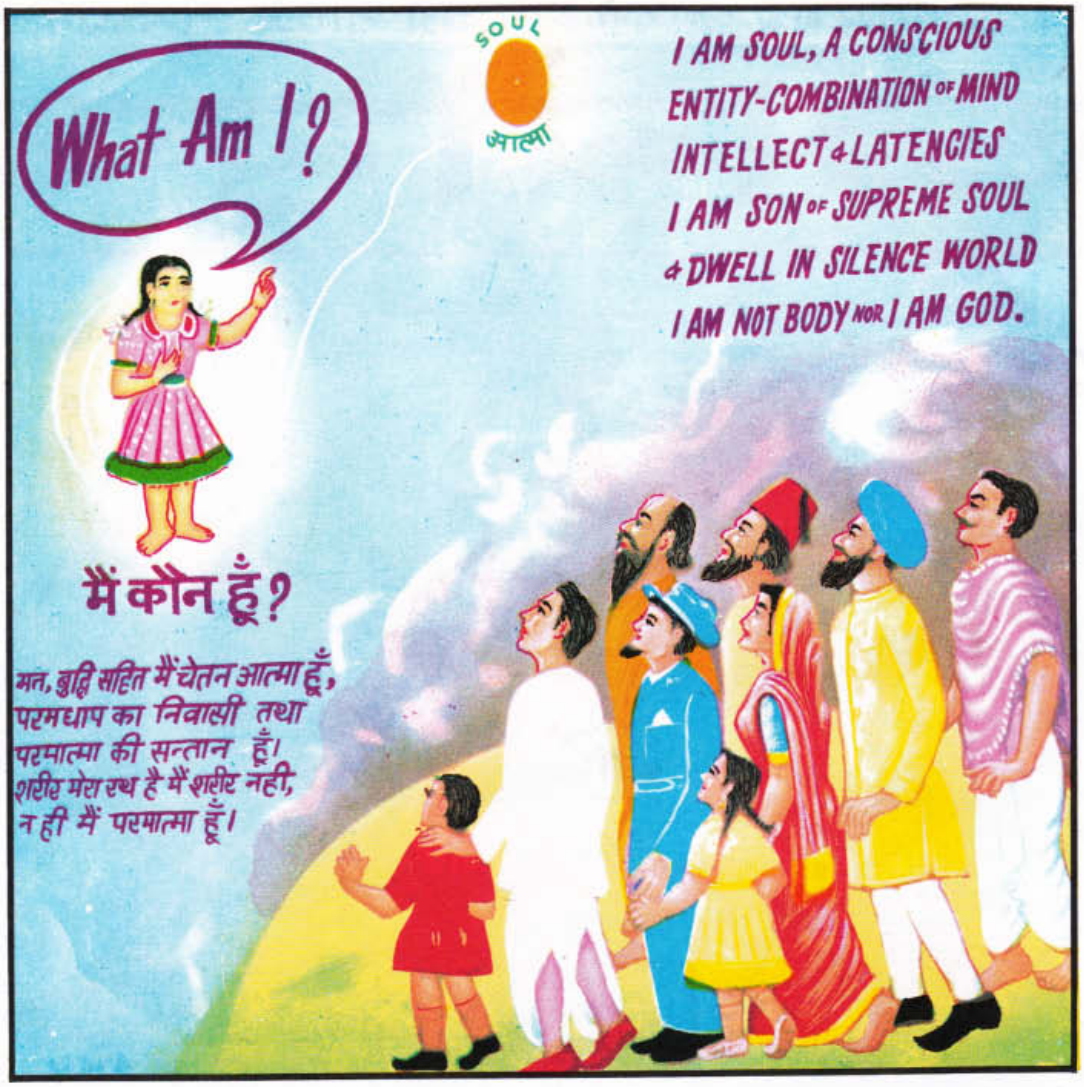


মানুষ নিজের জীবনের অনেক কিছু প্রশ্নের সমাধান করে থাকে এর ফল স্বরূপ অনেক পুরস্কারও লাভ করে কিন্তু একটা ছোট প্রশ্নের জবাব কেহই জানেন না—"আমি কে" ? এখানে সকলেই সারাদিন "আমি" বলে থাকে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় আমি কে?—তাহলে কেউ বলবে আমি কৃষ্ণচন্দ্র বা রামচন্দ্র ইত্যাদি, কিন্তু সঠিক বিচার করলে বোঝা যাবে এই নামগুলো শরীরের নাম। শরীর হলো আমার কিন্তু আমি তো শরীর থেকে পৃথক, এই ছোট প্রশ্নের বাস্তবিক জবাব না জানার জন্য আজ সমস্ত মানুষ দেহ অভিমানী (Body-conscious) হয়ে গেছে। দেহের ধর্ম হলো কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপু : এই পাঁচ বিকার বশীভূত হয়ে আজ সবাই দুঃখে জর্জরিত।

এখন পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' বলছেন, আজ মানুষের এত অভিমান যে "আমি" মালিক, "আমি" অফিসার, "আমি" ব্যবসায়ী, "আমি" রাজনীতিবিদ।..... কিন্তু তার মধ্যে নিজেকে না জানার অজ্ঞানতাই থেকে গেছে—কি "আমি কে" ? এই সৃষ্টি নাটকের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান, আমি কোথা থেকে এসেছি, কখন এসেছি, কি ভাবে সুখ শান্তিময় রাজ্য হারিয়েছি এবং পরম পিতা পরমাত্মা কে?— এই সমস্ত রহস্য কেহই জানেন না। এখন এই জীবনের প্রকৃত পরিচয় জেনে মানুষ বিমূঢ় (Puzzle of life) অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেহি অভিমানি (Soul-conscious) হতে পারে। ইহার ফলে মানুষের আত্মা মুক্তি, জীবন মুক্তি লাভ করতে পারে। এই ভাবেই সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ, শান্তি প্রাপ্তি হয়। ইহার ফল স্বরূপ নর থেকে শ্রীনারায়ণ এবং নারী থেকে শ্রীলক্ষ্মী পদ প্রাপ্ত করা যায়।

# পথ-প্রদর্শনী

মানুষের যখন দুঃখ ও অশান্তি হয় তখন ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলে — "হে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, শান্তিদাতা প্রভু, আমায় শান্তি দাও।" বিকারগ্রস্ত মানুষ পবিত্রতার জন্য ঈশ্বর তথা পরমাত্মাকেই আর্জি জানিয়ে বলে — "হে দেব, আমার বিষয় বিকার মিটিয়ে দাও, পাপমুক্ত কর" অথবা "হে প্রভু, আমাদের শুদ্ধাই দাও, সকল অমঙ্গল দূর করে মঙ্গল এনে দাও।" কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা বিকার তথা সকল কলুষতা দূর করার জন্য যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন অধিকাংশ ব্যক্তি সে বিষয়ে অবগত নয় এবং নিজের ব্যবহারিক জীবনে তা ধারণ ও প্রয়োগ করে না। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের জীবনে পথ প্রদর্শন করান এবং সদা আমাদের সহায় থাকেন। কিন্তু তার জন্য আমাদের সততই পুরুষার্থ করতে হবে এবং তাহলেই আমরা প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাব এবং শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারব।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পরমপিতা পরমাত্মা প্রদত্ত জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সচিত্র এই ব্যাখ্যান পাঠককে অনেক গুহ্য রহস্য সহজ সরলভাবে বোধগম্য করায়। পাঠক তার আপন জ্ঞান রত্নের ঝুলি অনায়াসে পূর্ণ করে নিতে পারেন। যে কোন ব্যক্তি এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের যে কোন সেবাকেন্দ্রে পদার্পণ করে বিনামূল্যে রাজযোগের অভ্যাস এবং লৌকিক জীবনকে অলৌকিক জীবনে পরিবর্তন করার সহজ পদ্ধতি শিক্ষালাভ করতে পারেন।

# অমৃত সূচী


| | | পৃষ্ঠা নং | | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | পথ প্রদর্শনী | ১ | ১৬) | সৃষ্টি নাটকের রচয়িতা ও নির্দেশক কে? | ২৮ |
| ২) | আত্মা কী এবং মন কী? | ২ | ১৭) | কলিযুগ এখন শৈশবে নয় বরং বার্ধক্যে পৌঁছেছে | ৩১ |
| ৩) | ত্রিলোক কোথায় এবং পরমাত্মা শিবের নিবাস কোথায়? | ৫ | ১৮) | রাবণের কি দশ মাথা ছিল? | ৩২ |
| ৪) | একটি আশ্চর্য বিষয় | ৬ | ১৯) | মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য কী? | ৩৫ |
| ৫) | সর্ব আত্মার পিতা পরমাত্মা | ৯ | ২০) | অদূর ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন | ৩৬ |
| ৬) | পরমাত্মা ও তাঁর দিব্য কর্তব্য | ১০ | ২১) | গীতার জ্ঞানদাতা কে? | ৩৯ |
| ৭) | পরমাত্মার দিব্য অবতরণ | ১৩ | ২২) | গীতার জ্ঞান হিংসার যুদ্ধের জন্য দেওয়া হয়নি | ৪০ |
| ৮) | শিব ও শংকরের মধ্যে পার্থক্য | ১৪ | ২৩) | জীবন কমল পুষ্প সমান কীভাবে হয়? | ৪৩ |
| ৯) | একটি মারাত্মক ভুল | ১৭ | ২৪) | রাজযোগের আধার তথা বিধি | ৪৪ |
| ১০) | সৃষ্টিরূপী উল্টো ও অদ্ভুত বৃক্ষ | ১৮ | ২৫) | রাজযোগের স্তম্ভ তথা নিয়ম | ৪৭ |
| ১১) | প্রভু মিলনের যুগ-পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ | ২১ | ২৬) | রাজযোগের দ্বারা প্রাপ্তি - অষ্টশক্তি | ৪৮ |
| ১২) | মানুষের ৮৪ জন্মের অদ্ভুত কাহিনি | ২২ | ২৭) | রাজযোগের যাত্রা - স্বর্গীয় জীবনের দিকে যাত্রা | ৫১ |
| ১৩) | মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনি ধারণ করে না | ২৫ | ২৮) | শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ | ৫২ |
| ১৪) | প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় | ২৬ | | | |
| ১৫) | প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও জগদম্বা সরস্বতীর প্রকৃত পরিচয় | ২৭ | | | |

# আত্মা কী ও মন কী ?

সারা দিনের কথাবার্তার মধ্যে মানুষ না জানি কতবার 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করে। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে 'আমি' ও 'আমার' এই দুটি শব্দের বহুবার প্রয়োগ সত্ত্বেও মানুষ যথার্থ রূপে 'আমি' বলার সত্তাকে ও তার স্বরূপ কী অর্থাৎ 'আমি' শব্দ যে সত্তার সূচক তা জানে না। আজ মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ শক্তিশালী বস্তু নির্মাণ করেছে, সংসারের অনেক রহস্যের উত্তর খুঁজে পেয়েছে এবং নানা প্রকার জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য সদা সচেষ্ট। কিন্তু 'আমি' বলার কর্তা কে সে বিষয়ে সত্য কী জানে না অর্থাৎ নিজেকে সে চেনে না। আজ যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় — 'আপনি কে? বা আপনার পরিচয় কী?' তাহলে এক মুহূর্তে সে নিজের শরীরের যে নাম অথবা তার লৌকিক কাজকর্ম বা পদবীর কথা বলে দেবে।

প্রকৃতপক্ষে 'আমি' শব্দ শরীর থেকে ভিন্ন চেতন সত্তা 'আত্মার' সূচক (চিত্রে যেমন দেখান হয়েছে), মানুষ (জীবাত্মা) 'আত্মা' এবং 'শরীর' এই দুয়ে মিলে গঠিত। 'শরীর' যেমন পাঁচ তত্ত্বে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ ও ব্যোম) তৈরি ঠিক তেমনি 'আত্মাও' মন, বুদ্ধি ও সংস্কারের সমন্বয়ে গঠিত। আত্মার মধ্যেই নির্ণয় ও বিচার করার শক্তি থাকে, তথা যে যেমন কর্ম করে সেই অনুসারে তার সংস্কার তৈরি হয়।

আত্মা এক চেতন এবং অবিনাশী সত্তা ও তার রূপ দিব্য জ্যোতি-র্বিন্দু স্বরূপ যা মানুষের দেহে ভ্রূযুগলের মধ্যে অবস্থান করে। রাত্রির আকাশে তারাকে যেমন ঝিক্‌মিক্ করা বিন্দুর মত দেখায় ঠিক তেমনি দিব্য দৃষ্টির দ্বারা আত্মাকেও একটি তারার মত দেখা যায়। কবির ভাষায় — "ভ্রূকুটি মাঝে চমকায় এক আজব তারা" আত্মা ভ্রূকুটির মাঝে অবস্থান করে বলেই মানুষ যখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করে তখন কপালে হাত রাখে এবং যখন সে বলে 'আমার ভাগ্যই খারাপ' তখনও সে তার কপালকে নির্দেশ করে। আত্মার বাস ভ্রূকুটির মধ্যে বলেই ভক্তদের কপালে বিন্দি কাটা বা তিলক লাগাবার প্রথা আছে। এর দ্বারা আত্মার সম্বন্ধ মস্তিষ্কের সঙ্গে তা বোঝা যায় এবং মস্তিষ্কের সম্বন্ধ সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমূহের সহিত। আত্মার মধ্যেই প্রথমে সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, পরে তা মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুমন্ডলের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। আত্মাই সুখ দুঃখের অনুভব ও নির্ণয় করে এবং আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি ও সংস্কার থাকে। সুতরাং মন ও বুদ্ধি আত্মা থেকে পৃথক নয়। কিন্তু আজ আত্মা নিজেকে ভুলে দেহ — স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক ইত্যাদি মনে করে বসে আছে। এই দেহ — অভিমানই যত দুঃখের মূল কারণ।

উপরোক্ত বিষয়টি একটি মোটরচালকের উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেখান হয়েছে। শরীরটাকে যদি মোটরগাড়ী মনে করা হয় তাহলে 'আত্মা' তার চালক (Driver)। অর্থাৎ 'চালক' যেমন মোটরগাড়ী নিয়ন্ত্রণ করে 'আত্মাও' তেমনি শরীররূপী গাড়ী বা রথকে নিয়ন্ত্রণ করে। আত্মা বিনা শরীর মৃত, যেমন ড্রাইভার বিনা গাড়ী অচল।

বর্তমানে পরমাত্মা বলছেন যে, মানুষ নিজেকে চিনতে পারলেই এই শরীর রূপী মোটর চালিয়ে আপন লক্ষ্যে (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছতে পারবে। সাধারণত চালক যদি নিপুণ না হয় তাহলে সে দুর্ঘটনার (accident) শিকার হয় এবং গাড়ী ও যাত্রী উভয়ের আঘাত লাগে ঠিক তেমনি মানুষ যদি নিজের পরিচয় না জানে তাহলে স্বয়ং সে দুঃখী ও অশান্ত হবে এবং একইরূপে তার সম্পর্কে আসা আত্মীয় বন্ধু পরিজনদেরও দুঃখী ও অশান্ত করে তুলবে। সুতরাং প্রকৃত সুখ ও শান্তির জন্য নিজেকে জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

# 'आत्मा' ও 'মন' কী?

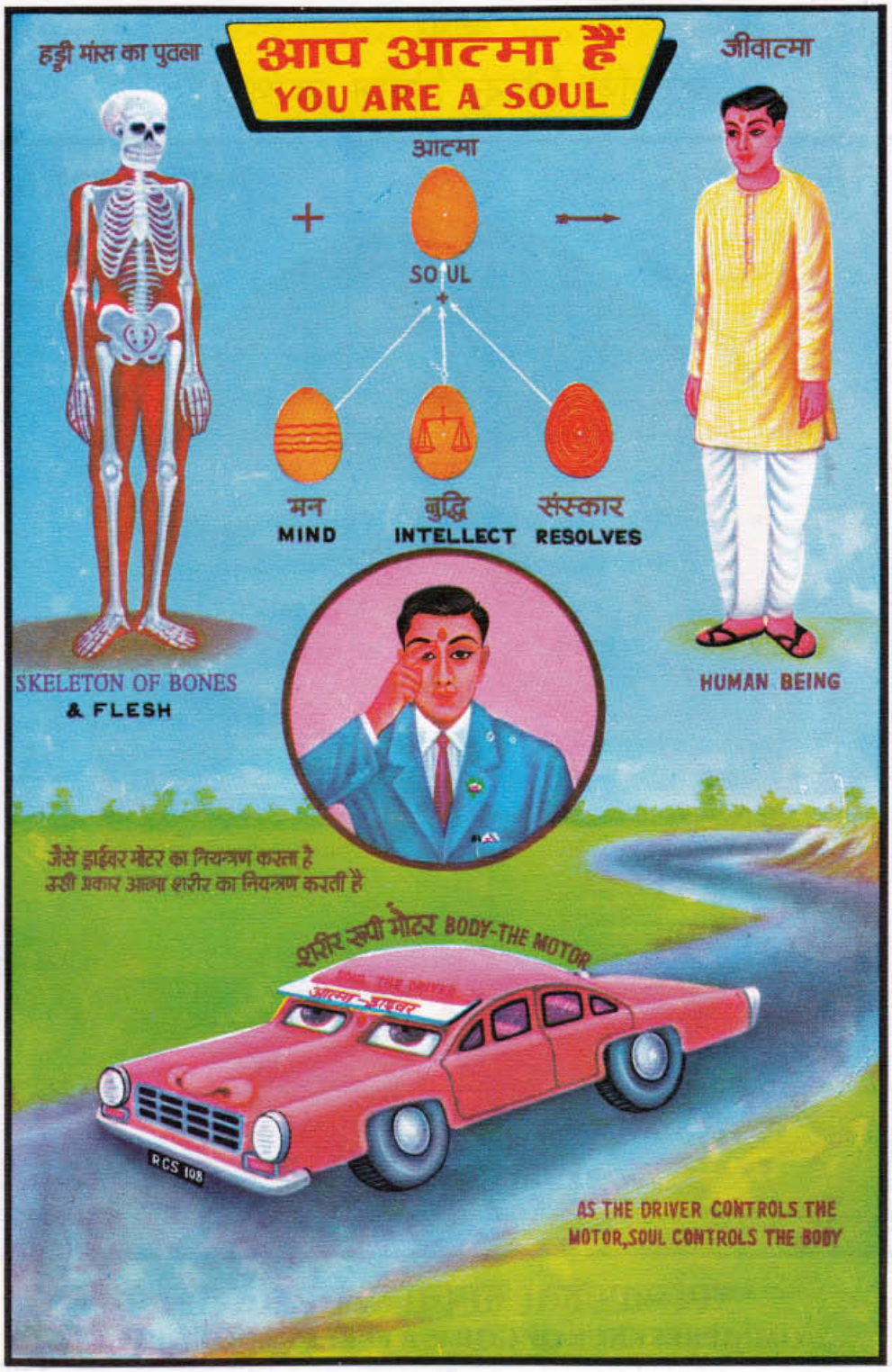
हड्डी मांस का पुतला
आप आत्मा हैं
YOU ARE A SOUL
जीवात्मा
आत्मा
SOUL
मन
MIND
बुद्धि
INTELLECT
संस्कार
RESOLVES
SKELETON OF BONES
& FLESH
HUMAN BEING
जैसे ड्राईवर मोटर का नियन्त्रण करता है
उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियन्त्रण करती है
शरीर रूपी मोटर BODY-THE MOTOR
आत्मा ड्राईवर
RCS 108
AS THE DRIVER CONTROLS THE
MOTOR,SOUL CONTROLS THE BODY

# তিন লোক কি কি
# এবং
# পরমাত্মা শিবের নিবাস কোথায়?

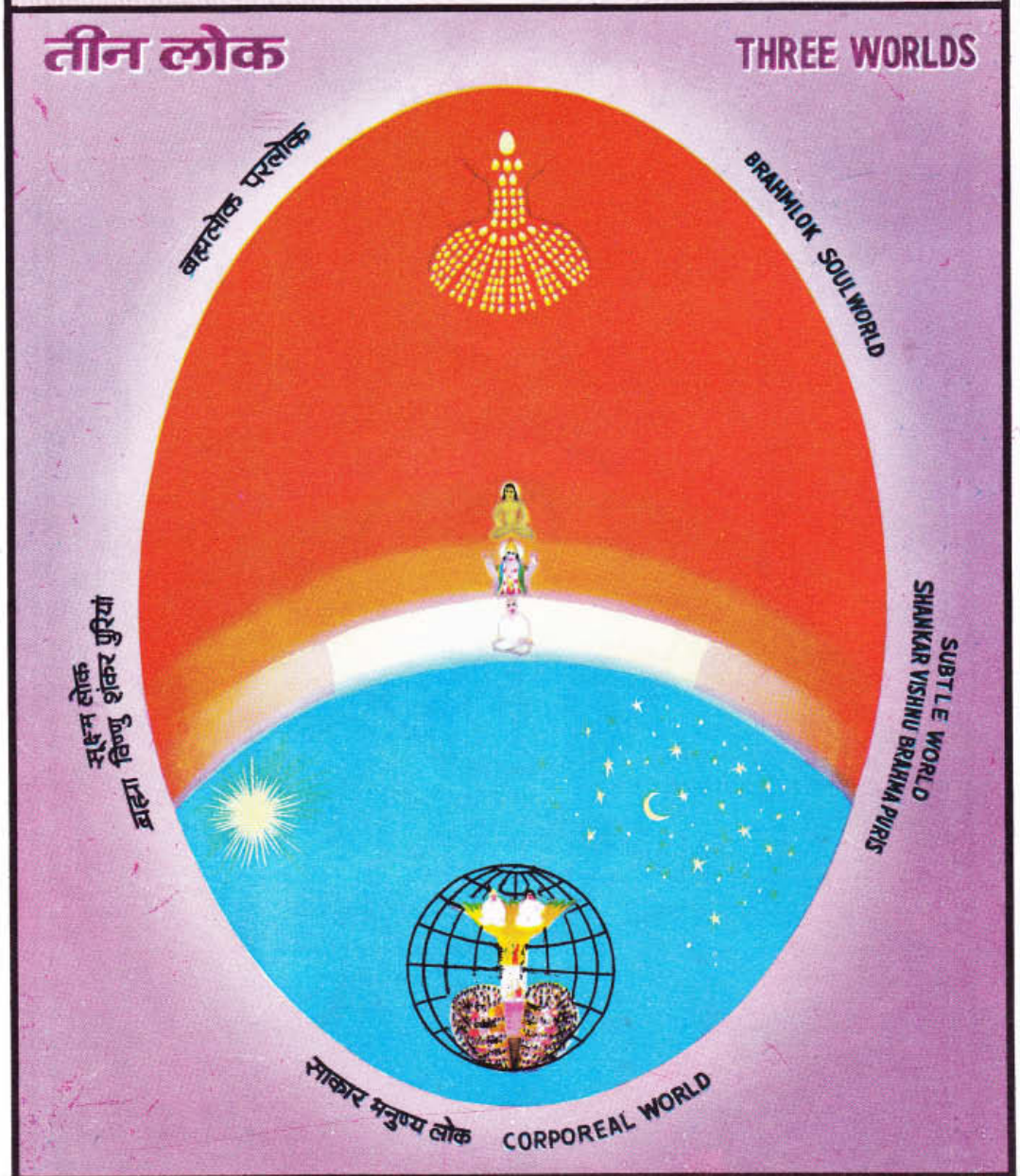


**सर्वव्यापकता भावना है, सिद्धांत नहीं**

**OMNIPRESENCE OF GOD IS A FEELING, NOT A FACT.**

# তিন লোক কোথায় ও পরমাত্মা শিবের ধাম কোথায়?

মনুষ্যাত্মা মুক্তি ও পরম শান্তি পাবার কামনা করে কিন্তু সে জানে না মুক্তিধাম বা শান্তিধাম কী? একইভাবে মনুষ্যাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে চায় এবং তাঁকে স্মরণও করে কিন্তু জানে না সেই পবিত্রধাম কোথায় যেখন থেকে পরমপিতা 'শিব' এই সৃষ্টিতে অবতরণ করেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে স্থান থেকে আমরা সব মনুষ্যাত্মা এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে এসেছি সেই প্রিয় দেশকে সবাই ভুলে গেছি এবং সেখানে কেউ স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে পারে না।

১। **সাকার মনুষ্য লোক** — পাশের চিত্রে নীল অংশে দেখান হয়েছে পৃথিবীকে যাকে বলে সাকার "মনুষ্য লোক" যেখানে বর্তমান সময়ে আমরা আছি। এখানে সকল আত্মা হাড় মাংসের স্থূল শরীরের দ্বারা কর্ম করে ও তার ফল সুখ দুঃখরূপে ভোগ করে - তথা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে। এই লোকে সংকল্প, ধ্বনি ও কর্ম তিনটিই আছে। ইহাকে পাঁচ তত্ত্বের সৃষ্টি বা কর্মক্ষেত্র বলা হয়। এই সৃষ্টি আকাশ-তত্ত্বের একটি অংশ মাত্র। সাকার লোকে এটিকে উল্টো বৃক্ষরূপে দেখান হয়েছে কারণ এর বীজরূপ পরমাত্মা 'শিব' স্বয়ং যিনি জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত, তিনি উপরে থাকেন।

২। **সূক্ষ্ম দেবলোক** — এই দেবলোক, সূর্য তারা থেকেও দূরে তথা আকাশতত্ত্ব থেকেও দূরে এক সূক্ষ্মলোক যেখানে শুধু আলোকে আলোকময়। এই আলোকময় দুনিয়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের ভিন্ন ভিন্ন পুরী আছে। এই দেবতাগণের শরীর হাড় মাংসের নয় কিন্তু **আলোর প্রকাশে প্রকাশিত।** এঁদের একমাত্র দিব্য চক্ষু দ্বারাই দেখা যায়। এখানে দুঃখ বা অশান্তি নেই। এখানে সংকল্প আছে, ক্রিয়া আছে বার্তালাপও আছে কিন্তু কোন আওয়াজ বা ধ্বনি নেই।

৩। **ব্রহ্মলোক ও পরলোক** — দেবলোক থেকেও দূরে এক 'লোক' আছে যাকে 'ব্রহ্মলোক' 'পরলোক' নির্বাণ-ধাম', 'মুক্তি-ধাম', 'শান্তি-ধাম', 'শিবলোক' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এখানে স্বর্ণময় রক্তিম বর্ণের দিব্যজ্যোতি ছড়িয়ে আছে যাকে 'ব্রহ্ম-তত্ত্ব', ষড়-তত্ত্ব অথবা 'মহা-তত্ত্ব' বলা হয়। এরই এক অংশে জ্যোতির্বিন্দু আত্মা 'মুক্তি'-র অবস্থায় থাকে। এখানে সর্ব-ধর্মের আত্মাগণের নির্দিষ্ট স্থান (Sections) আছে।

এদের সবার উপরে সদা মুক্ত, চৈতন্য জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ পরমাত্মা 'সদা শিবের' নিবাস স্থল। মনুষ্যাত্মা কল্পের শেষে, সৃষ্টি মহাবিনাশের পরে নিজ নিজ কর্মভোগের পর তথা পবিত্র হবার পরে এই (ব্রহ্ম) লোকে ফিরে যায়। এখানে মনুষ্যাত্মা দেহবন্ধন, কর্মবন্ধন তথা জন্মমৃত্যু রহিত হয়ে যায়। এখানে সংকল্প, বচন বা কর্মের কিছুই থাকে না। এই লোকে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' ব্যতীত অন্য কোন গুরু আদি নিয়ে যেতে পারেন না। এই লোকে যাবার অর্থই হলো অমরনাথ, রামেশ্বরম অথবা বিশ্বেশ্বর, নাথের নিকট সত্য সত্য যাত্রা, কারণ অমরনাথ পরমাত্মা 'শিব' এখানে অবস্থান করেন।

# একটি আশ্চর্য বিষয়

প্রায় সকল মানুষই পরমাত্মাকে 'হে পিতা', হে দুঃখহর্তা সুখদাতা প্রভু (Oh! Hevaenly God Father) ইত্যাদি সম্বন্ধসূচক শব্দে স্মরণ করে থাকে। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের কথা যে তাঁকে তারা পিতা সম্বোধনে ডাকে সত্য কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানে না ফলে তাঁর সাথে তাদের অকৃত্রিম স্নেহ বা সম্বন্ধও থাকে না। পরিচয় এবং স্নেহ না থাকার জন্য পরমাত্মাকে যখন তারা স্মরণ করে তখন তাদের মন একাগ্রভাবে একস্থানে স্থির থাকে না। এজন্য তারা পরমপিতা পরমাত্মার নিকট থেকে সুখ ও শান্তি যা তার জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে পাওয়া উচিত তা পায় না। তারা না পারে পরমপিতা পরমাত্মার মধুর মিলনের প্রকৃত সুখ অনুভব করতে, না পারে জ্ঞানের আলো (Light) ও শক্তি (Might) অর্জন করতে এবং ত.র সংস্কার তথা জীবনেও কোন বিশেষ পরিবর্তন আসতে পারে না। এজন্য আমরা এখানে সেই পরমপ্রিয় পরমাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানাচ্ছি যা তিনি স্বয়ং মানব কল্যাণে আমাদের বুঝিয়েছেন, অনুভব করিয়েছেন এবং এখনও করাচ্ছেন।

## পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য নাম ও তাঁর মহিমা

পরমপিতা পরমাত্মার নাম 'শিব'। 'শিব' কথার অর্থ কল্যাণময়। পরমপিতা পরমাত্মা 'শিবই' জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর ও প্রেমের সাগর। তিনিই পতিতকে পাবন করেন, মানুষের শান্তিধাম তথা সুখধামের তিনিই একমাত্র পথ প্রদর্শক (Guide), বিকার তথা কালের বন্ধনের মুক্তিদাতা (Liberator) তিনিই স্বয়ং এবং তিনি সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়াময় (Merciful) মনুষ্য মাত্রেরই মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি অথবা গতি ও সদ্‌গতি দাতা একমাত্র তিনি। দিব্যচক্ষু এবং দিব্য দৃষ্টি দান করার বরদাতাও তিনি। মনুষ্যাত্মাকে জ্ঞানরূপী 'সৌম' অথবা অমৃত পান করিয়ে তিনি অমরত্বের বরদান অর্পণ করেন বলে তাঁকে 'সোমনাথ' তথা 'অমরনাথ' এই নামে অভিহিত করা হয়। তিনি জন্মমৃত্যু থেকে সদা মুক্ত, সদা একরস, সদা জাগ্রত জ্যোতি ও 'সদা-শিব'।

## পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য রূপ

পরমপিতা পরমাত্মার দিব্যরূপ এক দিব্য জ্যোতির্বিন্দু সমান প্রদীপ্ত প্রদীপের মত। তাঁর অনুপম ঐরূপ অতি উজ্জ্বল ও নির্মল, সোনালি লাল (Golden Red) শান্ত ও মনোমুগ্ধকারী। এই জ্যোতির্ময় রূপ একমাত্র দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখা যায় ও দিব্যবুদ্ধি দ্বারা অনুভব করা যায়। পরমপিতা পরমাত্মার ঐ জ্যোতির্বিন্দু রূপের প্রতিমা শিবলিঙ্গ রূপে এই ভারতে পূজিত হয় এবং **শিবের অবতরণকে স্মরণ করে 'মহা শিবরাত্রি' পালিত হয়।**

## নিরাকারের অর্থ

প্রায় সর্ব ধর্ম নির্বিশেষে পরমাত্মাকে 'নিরাকার' (incorporeal) মানা হয়। কিন্তু একথার অর্থ করা হয় যে পরমাত্মার কোন আকার (রূপ) নেই। এখন পরমপিতা পরমাত্মা শিব স্বয়ং বলছেন যে এরূপ মনে করা ভুল। বাস্তবে নিরাকারের অর্থ হল শারীরিক আকার হীন অর্থাৎ তার না মানুষের ন্যায় সাকার স্থূল দেহ আছে না দেবতার মত সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব আছে পরন্তু তাঁর রূপ অশরীরী জ্যোতি-র্বিন্দু স্বরূপ। বিন্দুকে তো নিরাকারই বলা উচিত। অতএব এটি একটি আশ্চর্যজনক কথা যে পরমপিতা পরমাত্মা এক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতির দিব্য চেতন পরমাণু। কিন্তু আজ লোকে প্রায়ই ভ্রমবশতঃ বলে যে তিনি অণু-পরমাণুতে মিশে আছেন।

# আশ্চর্যজনক পরিচয়

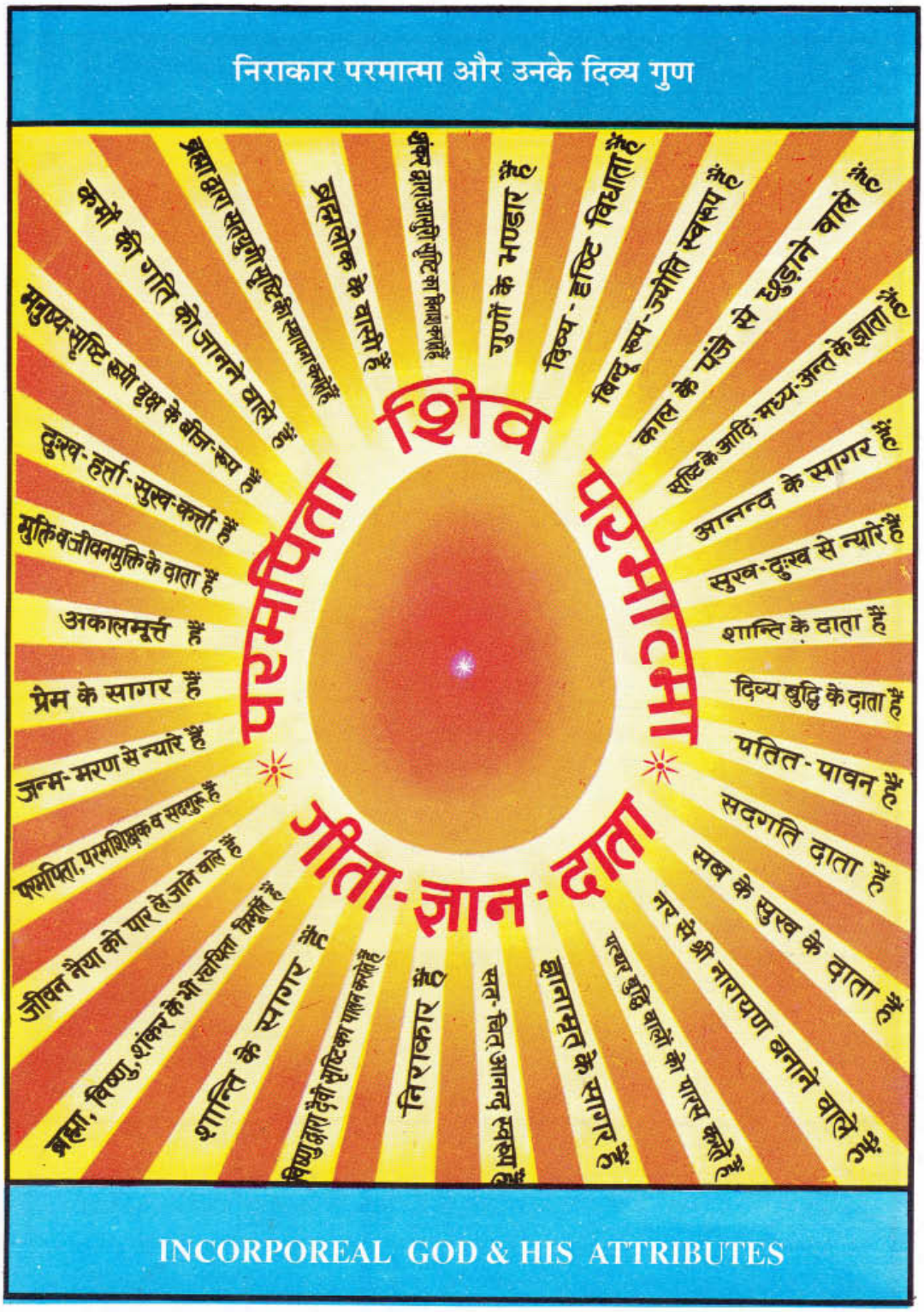

সকল আত্মার পিতা পরমাত্মা এক ও নিরাকার

# सर्व आत्माओं के पिता

## SUPREME FATHER OF ALL SOULS

प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात् अशरीरी मानते हैं। शिवलिङ्ग ज्योति-बिन्दु परमात्मा की ही यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है। परमात्मा शिव ही हम सर्वात्माओं के परमपिता, परमशिक्षक एवं परमसद्गुरु हैं। अतः निराकार ज्योति-बिन्दु स्वरूप परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं।

# সর্ব আত্মার পিতা পরমাত্মা এক ও নিরাকার

লোকে প্রায়ই স্লোগান দেয় যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ঈশাই সবাই ভাই ভাই। কিন্তু তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে কীভাবে ভাই ভাই এবং যদি ভাই ভাই হয় তাহলে তাদের সবার এক পিতা কে? — এটা কেউই জানে না। স্থূল দৃষ্টিতে তারা ভাই ভাই হতে পারে না কারণ তাদের সবার মাতা-পিতা পৃথক পৃথক। সুতরাং আত্মিক দৃষ্টিতেই তারা সবাই এক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান হওয়ার জন্য ভাই ভাই। এখানে সব আত্মাকেই এক পরমপিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই স্মৃতিতে স্থিত হলে দেশে দেশে একতা আসতে বাধ্য।

প্রায় সর্বধর্মের লোকে বলে যে পরমাত্মা (ঈশ্বর) এক এবং তিনি সবার পিতা এবং মানুষে মানুষে সব ভাই ভাই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে সেই পারলৌকিক পরমপিতা কে যাঁকে সবাই মান্য করে? সবারই জানা যে, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভিন্ন ভিন্ন, তবু প্রত্যেক ধর্মে নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মা শিবের প্রতিমার (শিবলিঙ্গের) কোন না কোন প্রকারে মান্যতা আছে। ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে শিবের মন্দির আছে এবং ভক্তগণও "ওঁ নমঃ শিবায়" তথা তুমিই পিতা তুমিই মাতা ইত্যাদি সম্বোধনে তাঁর গান বা পূজা করে এবং শিবকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম প্রমুখ দেবতাদেরও দেবতা অর্থাৎ পরমপূজ্য বলে মান্য করে। কিন্তু ভারতের বাইরে অন্য ধর্মের লোকেও পরমাত্মা শিবকে মান্যতা দেয়। এখানে পাশের চিত্রে দেখান হয়েছে যে শিবের স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যেক ধর্মে আছে।

অমরনাথ, বিশ্বনাথ, সোমনাথ, পশুপতিনাথ ইত্যাদি মন্দিরে শিবরেই স্মৃতিচিহ্ন আছে। 'গোপেশ্বর' এবং 'রামেশ্বর' যে মন্দির আছে তার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'শিব' শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের পূজ্য। রাজা বিক্রমাদিত্যও শিবেরই পূজা করতেন। মুসলমানদের প্রধান তীর্থভূমি মক্কাতেও এই আকারের একটি পাথর আছে যাকে তারা 'সংগ-এ-অসবদ্' বলে এবং সেটি ইব্রাহিম তথা মুহম্মদ দ্বারা স্থাপিত হয়েছে বলে মানে। কিন্তু তাদের ধর্মে প্রতিমা পূজার প্রথা (বুত্‌পরস্তী) না থাকা সত্ত্বেও কেন এই আকার বিশিষ্ট পাথরের স্থাপনা হল এবং কেনই বা তাদের মধ্যে এটিকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সাথে চুম্বনের প্রথা প্রচলিত? সেই রহস্য কেউই জানে না। ইটালিতে কোন কোন রোমান ক্যাথলিক ঈশাইরা (খৃষ্টান) এরূপ আকার বিশিষ্ট পাথরকে নিজেদের রীতি অনুসারে পূজা করে। ঈশাইদের ধর্মস্থাপক ঈসা (যিশু) এবং শিখদের ধর্মস্থাপক গুরু নানকও নিরাকার জ্যোতিকেই (God is light) ঈশ্বর রূপে মেনেছেন। ইহুদিগণ পরমাত্মাকে জিহোবা (Jehovah) নামে ডাকে যে নাম শিব (SHIVA) এই শব্দের রূপান্তর। জাপানেও বৌদ্ধ ধর্মের কিছু অনুগামী এইরূপ জ্যোতির (LIGHT) প্রতিমা সামনে রেখে তার উপর মনের একাগ্রতা স্থাপনের অভ্যাস করে।

কিন্তু সময়ান্তরে সব ধর্মের লোক এই কথা ভুলে গেছে যে শিবলিঙ্গ সর্বমনুষ্য আত্মার পরমপিতার স্মারকচিহ্ন। যদি মুসলমানদের একথা জানা থাকত তবে তারা কখনও সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করত না। বরং মুসলমান, ঈশাই ইত্যাদি সর্বধর্মের লোকেরা ভারতকেই পরমপিতা পরমাত্মার অবতরণ-ভূমি জেনে একেই মুখ্য তীর্থভূমি বলে মান্য করত এবং তার ফলে আজ পৃথিবীর ইতিহাস অন্য প্রকার হত। কিন্তু এক পিতাকে ভুলে যাবার জন্য আজ সংসার লড়াই-ঝগড়া, দুঃখ-ক্লেশে ভরে গেছে এবং সবাই অনাথ ও কাঙাল হয়ে গেছে।

# পরমপিতা পরমাত্মা এবং তাঁর দিব্য কর্তব্য

পাশের পৃষ্ঠায় পরমপিতা পরমাত্মা জ্যোতির্বিন্দু, শিবের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখান হয়েছে যে কলিযুগের অন্তে ধর্মগ্লানি অথবা অজ্ঞান রাত্রির সময় 'শিব' সৃষ্টির কল্যাণার্থে তিন সূক্ষ্ম দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের রচনা করেন এবং এই কারণে শিবকে 'ত্রিমূর্তিশিব' বলা হয়। তিন দেবতা রচনার পর 'শিব' স্বয়ং এক সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে অবতরণ করেন যাঁর নাম তিনি 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা' রাখেন।

পরমপিতা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য আত্মার সহিত পিতা, শিক্ষক এবং সদ্‌গুরুরূপে মিলিত হন এবং সহজ গীতা জ্ঞান তথা সহজ রাজযোগ শিক্ষা দিয়ে তাদের সদ্‌গতি করান অর্থাৎ জীবন্মুক্তি দান করেন।

## শংকর দ্বারা কলিযুগী সৃষ্টির মহাবিনাশ

কলিযুগের শেষে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যেমন সত্যযুগী দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা হতে থাকে তেমনি পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' পুরাতন আসুরী সৃষ্টির মহাবিনাশের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। পরমাত্মা শিব শংকরের দ্বারা বিজ্ঞান মদমত্ত তথা বিপরীত বুদ্ধি আমেরিকান তথা ইউরোপীয়দের (যাদবদের) প্রেরণা দিয়ে তাদের দ্বারা এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন (Hydrogen) বোমা এবং মিশাইল ইত্যাদি তৈরি করান যা মহাভারতে 'মুষল' (Missile) ও ব্রহ্মাস্ত্ররূপে বর্ণিত হয়েছে। এদিকে ভারতবর্ষেও দেহ-অভিমানী, ধর্ম-ভ্রষ্ট বিপরীত বুদ্ধি ব্যক্তিদের (যাদের মহাভারতের ভাষায় কৌরব বলা হয়েছে) গৃহযুদ্ধের (Civil War) জন্য প্রেরণা দেন।

## বিষ্ণু দ্বারা পালন

বিষ্ণুর চারটি হাতের মধ্যে দুটি শ্রীনারায়ণের ও দুটি শ্রীলক্ষ্মীর প্রতীক। 'শঙ্খ' তাঁর পবিত্র বাণী অথবা জ্ঞান ঘোষণার চিহ্ন। 'স্বদর্শনচক্র' আত্মার (স্ব) তথা সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানের প্রতীক। 'কমল ফুল' সংসারে থেকেও অনাসক্ত তথা পবিত্র থাকার সূচক এবং 'গদা' মায়া অর্থাৎ পাঁচ বিকারের উপর বিজয় লাভের চিহ্ন। অর্থাৎ মনুষ্যাত্মাদের সামনে বিষ্ণু চতুর্ভুজের লক্ষ্য রেখে পরমাত্মা শিব বোঝাচ্ছেন যে এই অলঙ্কার ধারণ করলে অর্থাৎ তাদের তাৎপর্য নিজের জীবনে যে প্রকৃতভাবে রূপদান করতে পারে সে নর হলে শ্রীনারায়ণের এবং নারী হলে শ্রীলক্ষ্মীর পদাধিকারী হয় অর্থাৎ মানুষ দ্বিমুকুট বিশিষ্ট দেবী দেবতা পদ পায়। এই দ্বিমুকুটের মধ্যে একটি প্রকাশের অর্থাৎ প্রভা-মণ্ডল (Crown of Light) যা পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক এবং অন্যটি সোনার মুকুট যা সম্পত্তি অথবা সুখ অথবা রাজ্যভাগ্যের সূচক।

এই প্রকারে পরমপিতা পরমাত্মা শিব সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের পবিত্র দৈবী সৃষ্টির (স্বর্গ) সংস্কার মানুষকে ধারণ করাতে থাকেন যার ফলস্বরূপ সত্যযুগে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীলক্ষ্মী (যাঁরা পূর্বজন্মে প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও সরস্বতী ছিলেন) সূর্যবংশী রাজ্যের অন্যান্য রাজা ও প্রজাদের পালন করেন। আর ত্রেতাযুগে শ্রীরাম ও শ্রীসীতা দেবী চন্দ্রবংশী রাজ্যে রাজত্ব করেন।

একথা স্মরণ থাকে যে, বর্তমান সময় পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তথা তিন দেবতার দ্বারা উপরোক্ত কর্তব্য করে চলেছেন। এখন আমাদের কর্তব্য হল পরমপিতা পরমাত্মা শিব তথা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে নিজের আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করা তথা পবিত্র হবার অর্থাৎ সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ হবার জন্য পুরুষার্থ করা।

# পরমপিতা পরমাত্মা এবং তাঁহার দিব্য কর্তব্য

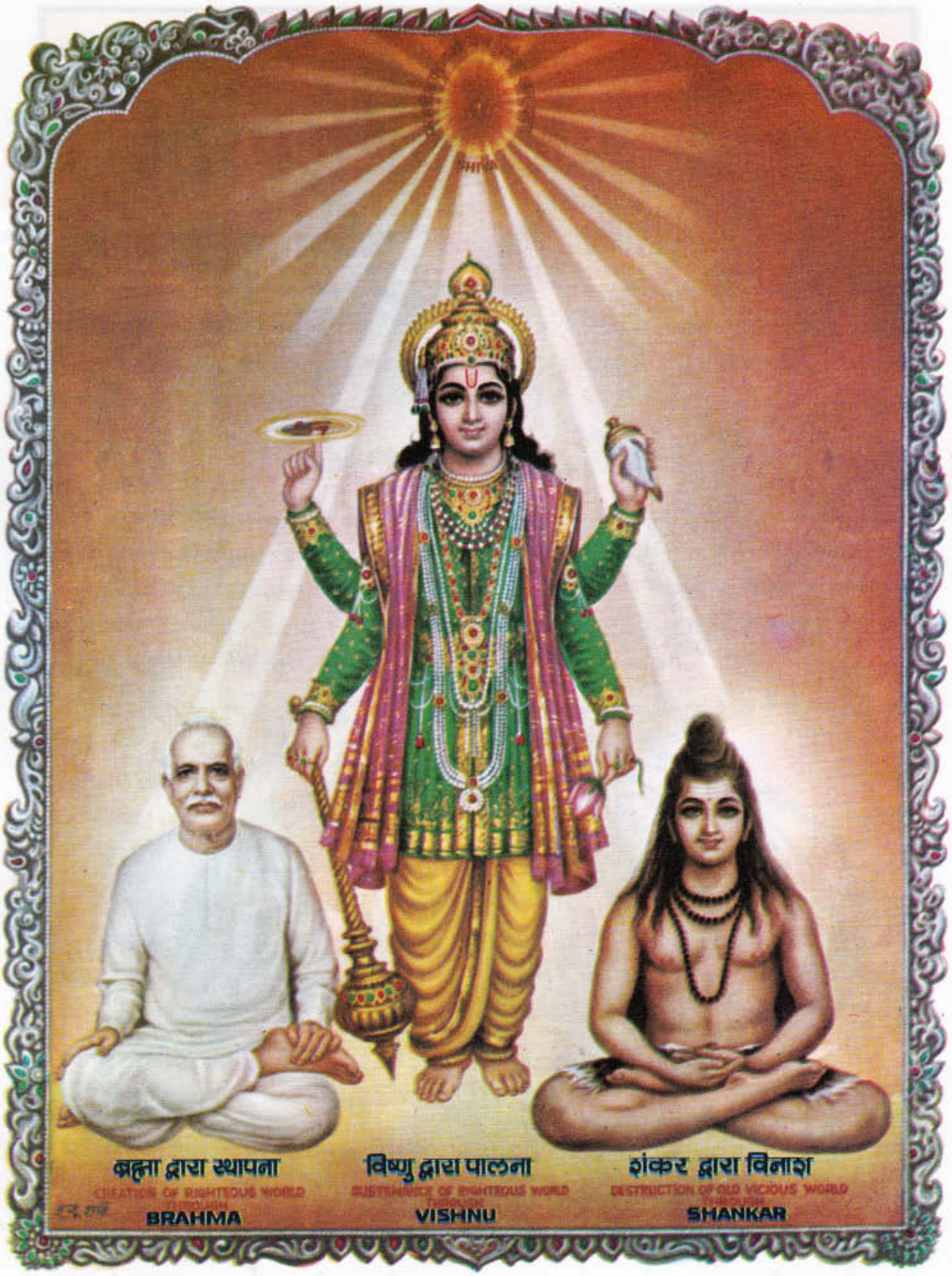

# পরমাত্মার দিব্য অবতরণ

# পরমাত্মার দিব্য অবতরণ

'শিব' কথার অর্থ কল্যাণময়। পরমাত্মার নাম শিব হবার কারণ তিনি ধর্ম-গ্লানির সময় যখন সকল মনুষ্যাত্মা মায়ার (পাঁচ বিকার) বশে দুঃখী, অশান্ত, পতিত এবং ভ্রষ্টাচারী হয়ে পড়ে, তখন তিনি পুনরায় তাদের পুণ্যবান তথা সম্পূর্ণ সুখী করার কল্যাণকারী কর্তব্য করেন। পরমপিতা পরমাত্মা শিব ব্রহ্মালোকে থাকেন। তিনি কর্ম-ভ্রষ্ট তথা ধর্ম-ভ্রষ্ট সংসারকে উদ্ধার করার জন্য ব্রহ্মালোক থেকে নীচে নেমে এসে এক বৃদ্ধের শরীরের আধার নিয়ে থাকেন। পরমপিতা পরমাত্মার এই অবতরণ অথবা দিব্য ও অলৌকিক জন্মের পুণ্য স্মৃতিতে **'শিবরাত্রি'** অর্থাৎ **শিবজয়ন্তী** উৎসব পালন করা হয়ে থাকে।

পরমপিতা পরমাত্মা যে সাধারণ বৃদ্ধ মনুষ্য শরীরে অবতরিত হন তাঁকে তিনি 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা' নামকরণ করেন। এরই স্মরণে শিবের প্রতিমার সামনে প্রতীক নন্দীকে (শিবের বাহন) দেখান হয়েছে। যেহেতু **পরমাত্মা সর্বআত্মার মাতা পিতা সেজন্য তিনি কোন মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন না। তবে ব্রহ্মার শরীরে সন্নিবেশই তাঁর দিব্যজন্ম ও অবতরণ।**

## অজন্মা পরমাত্মা শিবের দিব্যজন্মের রীতি

পরমাত্মা শিব কোন পুরুষের বীজ দ্বারা কোন মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন না কারণ তিনি নিজেই সকলের মাতা, পিতা মনুষ্য সৃষ্টির চেতন বীজ স্বরূপ এবং জন্ম মৃত্যু তথা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত। অতএব তিনি এক সাধারণ মানুষের বৃদ্ধ অবস্থার শরীরে প্রবেশ করেন। এ-কেই পরমাত্মা শিবের দিব্য অবতরণ বা দিব্যজন্ম বলা হয় কারণ তিনি যে শরীরে প্রবেশ করেন তা এক মনুষ্য আত্মার জন্ম-মৃত্যু কর্ম তথা বন্ধনের চক্রে আসা শরীর — পরমাত্মার নিজের শরীর হয় না।

অতএব চিত্রে দেখান হয়েছে যে, যখন সারা সৃষ্টি মায়ার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার ইত্যাদি পাঁচ বিকার) মুষ্টিবন্ধনে নিষ্পেশিত হয় তখন পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব', যিনি জন্ম-মৃত্যু গমনাগমনের চক্র থেকে মুক্ত, মনুষ্যাত্মাদের পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি বরদান দিয়ে মায়ার কবল থেকে মুক্ত করেন। তিনিই সহজ জ্ঞান ও রাজযোগের শিক্ষা দেন তথা সকল আত্মাকে পরমধামে নিয়ে যান এবং মুক্তি ও জীবন্মুক্তির বরদান দেন।

শিবরাত্রি উৎসব বিক্রম সম্বতের (সাল) শেষের মাস ফাল্গুন মাসে হয়। ঐ সময় কৃষ্ণাচতুর্দশীয় রাত্রি পূর্ণ অন্ধকার থাকে। এর পরই শুক্লপক্ষের শুরু হয় এবং কয়েকদিন পরে নতুন সম্বত শুরু হয়। অর্থাৎ রাত্রির ন্যায় ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দশী ও আত্মার অজ্ঞান অন্ধকার, বিকার অথবা আসুরী স্বভাবের পরাকাষ্ঠার শেষ অবস্থার জ্ঞাপক। এর পরেই আত্মার শুক্লপক্ষ অথবা নতুন কল্পের আরম্ভ হয় অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখের সময়ের শেষ হয়ে পবিত্র তথা সুখের সময় শুরু হয়।

পরমাত্মা শিব অবতীর্ণ হয়ে জ্ঞান, যোগ তথা পবিত্রতার দ্বারা আধ্যাত্মিক জাগরণের মহাবিপ্লব ঘটান। এই মহত্ত্বের ফল স্বরূপ ভক্তরা শিবরাত্রিতে জেগে থাকেন। এই দিনে মানুষ উপবাস, ব্রত ইত্যাদি করেন। উপবাস (উপ-নিকট, বাস থাকা বা অবস্থান করা) কথার প্রকৃত অর্থই হল পরমাত্মার নিকটস্থ হওয়া অর্থাৎ তাঁকে স্মরণ করা। অতএব পরমাত্মার সাথে যুক্ত বা মিলিত হবার জন্য পবিত্রতার ব্রত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

# শিব ও শংকরের মধ্যে পার্থক্য

বহু লোক শিব ও শংকরকে এক বলে মানে। কিন্তু বাস্তবে এ-দুয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে। শিবের মূর্তি ডিম্বাকৃতি অথবা অঙ্গুষ্ঠ আকারের ন্যায় কিন্তু শংকরের মূর্তি শরীরের আকার বিশিষ্ট। এখানে দু-জনের পরিচয় যা পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং আমাদের বুঝিয়েছেন ও অনুভব করিয়েছেন তা স্পষ্ট করা হচ্ছে —

## মহাদেব শংকর

১। ইনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরধারী। এঁকে মহাদেব বলা হয় কিন্তু পরমাত্মা বলা যায় না।
২। ইনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ন্যায় সূক্ষ্মলোকে শংকর পুরীতে বাস করেন।
৩। ব্রহ্মা দেবতা তথা বিষ্ণু দেবতার ন্যায় ইনিও পরমাত্মা শিবের রচনা।
৪। ইনি কেবল মহা বিনাশের কার্য করেন, স্থাপন ও পালন করা এঁর কর্তব্য নয়।

## পরমপিতা পরমাত্মা শিব

১। ইনি চেতন জ্যোতির্বিন্দু এবং তাঁর নিজস্ব কোন স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শরীর নেই। ইনিই পরমাত্মা।
২। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর লোক অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেবলোক থেকে দূরে ব্রহ্মলোকে (মুক্তিধামে) বাস করেন।
৩। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের রচয়িতা অর্থাৎ ত্রিমূর্তি।
৪। ইনি ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা মহাবিনাশ এবং বিষ্ণু দ্বারা বিশ্বের পালন করিয়ে বিশ্বের কল্যাণ করেন।

## শিবের জন্মোৎসব রাত্রিতে কেন হয়?

প্রকৃতপক্ষে 'রাত্রি' অজ্ঞানতা পাপ অথবা পাপাচারের নিশানি অতএব দ্বাপর এবং কলি যুগকেই 'রাত্রি' বলা হয়। কলিযুগের শেষে যখন সাধু, সন্ন্যাসী, গুরু আচার্য প্রমুখ সকল মনুষ্যই পতিত তথা দুঃখী হয় এবং অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং যখন এই ভারত বিষয় বিকারের জন্য বেশ্যালয়ে পরিণত হয়, তখন পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা শিব এই সৃষ্টিতে দিব্য জন্ম নিয়ে থাকেন এজন্য অন্য সবার জন্মোৎসব 'জন্মদিন' রূপে পালিত হয়। কিন্তু পরমাত্মা শিবের জন্মদিনকে 'শিব-রাত্রি' বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এই চিত্রে যে কালিমা অথবা অন্ধকার দেখান হয়েছে তা অজ্ঞান অন্ধকার অথবা বিষয় বিকাররূপী রাত্রির দ্যোতক।

## এই সৃষ্টিতে জ্ঞান সূর্য শিবের প্রকাশের সাথে সাথে অজ্ঞান অন্ধকার তথা বিকারের বিনাশ

যখন এই প্রকারে অবতরিত হয়ে জ্ঞান সূর্য পরমপিতা পরমাত্মা শিব জ্ঞানের 'প্রকাশ' দেন তখন অল্পকালের মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কলিযুগ তথা তমোগুণের স্থানে সংসারে সত্যযুগ ও সদ্‌গুণের স্থাপনা হয় ও অজ্ঞান অন্ধকার তথা বিকারের বিনাশ হয়ে থাকে। সারা কল্পের মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মার এক অলৌকিক জন্মের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে এই পৃথিবী শিবালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং নর পায় শ্রী নারায়ণের পদ এবং নারী শ্রী লক্ষ্মীর। এজন্য শিবরাত্রি হীরা তুল্য।

# শিব ও শংকরের মধ্যে পার্থক্য

সূক্ষ্মলোক নিবাসী, বিনাশকারী, আকারী দেবতা
(রচনা)

পরমধাম নিবাসী, কল্যাণকারী, নিরাকার পরমাত্মা
(রচয়িতা)

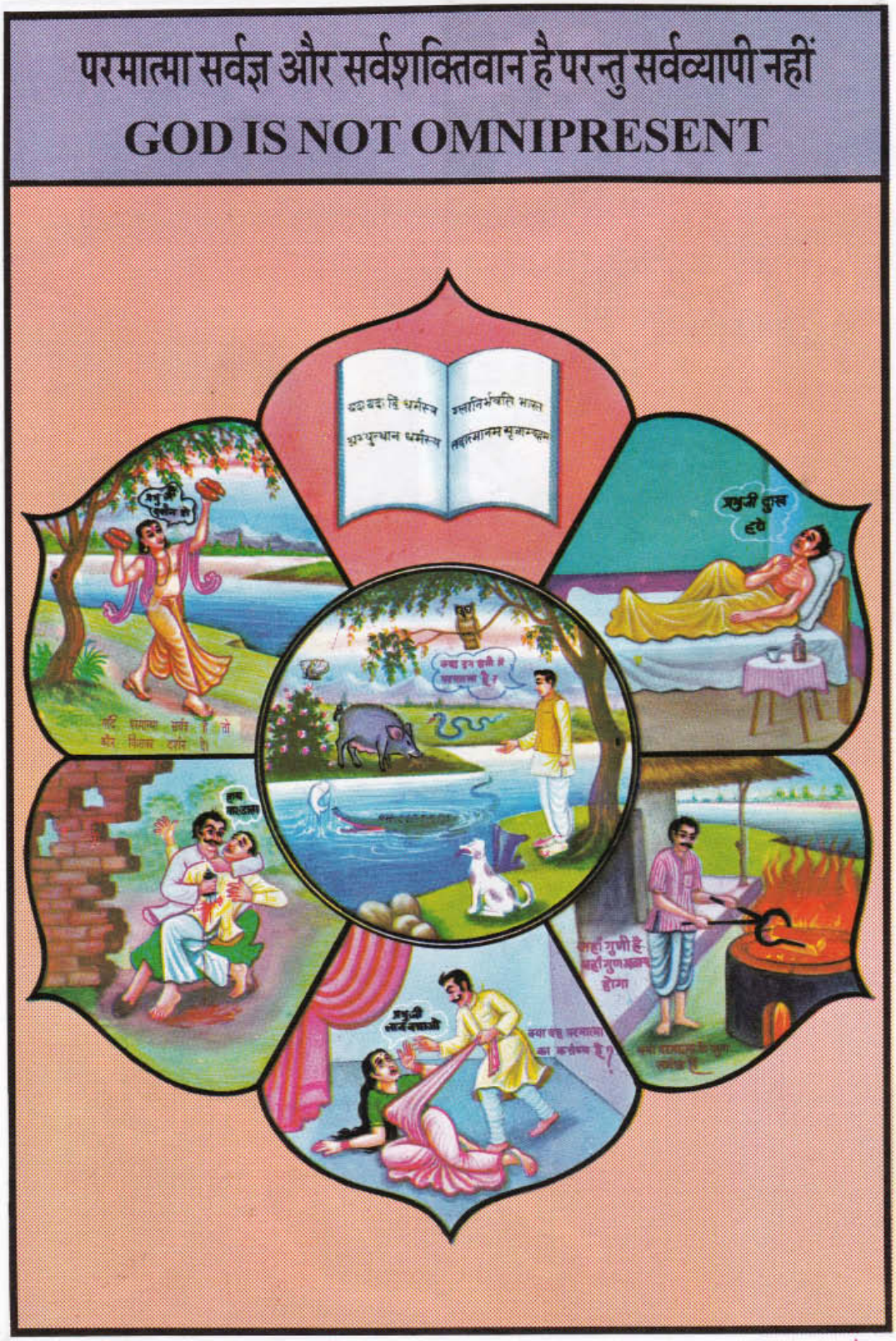

परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है परन्तु सर्वव्यापी नहीं
GOD IS NOT OMNIPRESENT

# একটি মারাত্মক ভুল

এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে আজ একদিকে লোকে পরমাত্মাকে 'মাতা-পিতা' ও 'পতিত-পাবন' বলে মানে আর অন্যদিকে বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী অর্থাৎ পায়ের নীচের পাথর, কাঁকর প্রভৃতি এবং সাপ, বিছা, কীট, পতঙ্গ, বরাহ, কুমীর, চোর, ডাকাত ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে আছে। ওঃ! নিজের পরমপ্রিয় পরমপবিত্র, পরমপিতাকে একথা বলা যে তিনি কুকুর বিড়াল বা সব কিছুর মধ্যে আছেন কত বড় মর্মান্তিক ভুল, কত বড় পাপ?

যদি পরমপিতা পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁর শিবলিঙ্গের রূপের পূজা কেন হয়? যদি তিনি যত্র তত্র সর্বত্রই হবেন তাহলে দিব্য জন্ম কীভাবে নেবেন? মানুষ তাঁর অবতরণের জন্য তাঁকে ডাকেই-বা কেন? কেনই-বা শিবরাত্রি উৎসব পালন করা হয়? যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপক হতেন তাহলে গীতাজ্ঞান তিনি কীভাবে দিতেন এবং গীতার মধ্যে লেখা এই মহাবাক্য কী করে সত্য সিদ্ধ হত যে "আমি পরম পুরুষ (পুরুষোত্তম); আমি সেই পরধামের নিবাসী যেখানে সূর্য ও তারাগণের আলোকও পৌঁছতে পারে না; এই সৃষ্টি একটি উল্টো বৃক্ষ স্বরূপ যার বীজ 'আমি' উপরে থাকি।"

যখনই এটা মেনে নেওয়া হল যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী তখন ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, সব কিছুই খন্ডিত হল কারণ জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের যদি কোন নাম ও রূপ না থাকে তাহলে না পারা যায় তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ (যোগ) রাখতে, না তাঁর প্রতি ভক্তি দেখান যাবে বা তাঁর নাম বা কর্তব্যের না চর্চা করা যাবে, কেন না জ্ঞানের অর্থই হল নাম, রূপ, ধাম, গুণ, কর্ম, স্বভাব, সম্বন্ধ বা তাঁর দ্বারা প্রাপ্তি ইত্যাদির পরিচয়। অতএব পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা মানলে মানুষ 'মন্মনা ভব' তথা 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই ঈশ্বরাজ্ঞার পথে চলতে পারে না অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার স্মৃতি ধারণ করতে পারে না এবং তাঁর সাথে স্নেহের সম্বন্ধও জুড়তে পারে না। উপরন্তু মানুষের মন দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। পরামাত্মা চৈতন্যময়, তিনি আমাদের পরমপিতা। পিতা কখনও সর্বব্যাপী নয়! **অতএব পরমপিতা পরমাত্মাকে - সর্বব্যাপী মেনে নেওয়ায় সকল নরনারী যোগভ্রষ্ট এবং পতিত হয়েছে আর সেই পিতৃদত্ত পবিত্রতা - সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখী তথা অশান্ত হয়েছে।**

সুতরাং ভক্তদের মধ্যে যে প্রবাদ আছে তা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে পরমাত্মা ঘটে ঘটে বাস করেন এরূপ বিবেচনা ঠিক নয়। বাস্তবে 'ঘট' অথবা হৃদয়কে প্রেম ও স্মরণের স্থান মানা হয়। দ্বাপর যুগের শুরুতে লোকের ঈশ্বরভক্তি অথবা প্রভুর প্রতি যথেষ্ট আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। হয়ত কদাচিৎ এমন এক আধ জন ছিল যে পরমাত্মাকে মান্য করত না। অতএব ঐ সময় ভাবে বিভোর ভক্তবৃন্দ এটাই বলত যে ঈশ্বর ঘটে ঘটে বসেন অর্থাৎ তাঁকে সবাই স্মরণ করেন, ভালবাসেন এবং সবার মনের মধ্যে ঈশ্বরের চিত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। এই শব্দগুলোর অর্থ স্বয়ং ঈশ্বরই সবার হৃদয়ে বাস করেন এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

# সৃষ্টিরূপী উল্টো অদ্ভুত বৃক্ষ ইহার বীজরূপে পরমাত্মা

ভগবান এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের তুলনা একটি উল্টোবৃক্ষের রূপে দেখিয়েছেন। কারণ অন্য বৃক্ষের বীজ মাটিতে বপন করা হয় এবং গাছ উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের যে অবিনাশী ও চেতন বীজরূপে পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' তিনি স্বয়ং পরমধাম ব্রহ্মলোকে বাস করেন।

চিত্রে নীচের দিকে কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের শুরু এই সঙ্গম সময় দেখান হয়েছে। ওখানে শ্বেত বস্ত্র পরিহিত ব্রহ্মা - সরস্বতী এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ সহজ রাজযোগের স্থিতিতে বসে আছেন। এই চিত্রের মাধ্যমে এই রহস্য বোঝানো হয়েছে যে কলিযুগের শেষে অজ্ঞান রাত্রিকালে সৃষ্টির বীজরূপ কল্যাণকারী, জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিব নতুন সৃষ্টি রচনার উদ্দেশ্যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে অবতরিত (প্রবিষ্ঠ) হয়েছেন এবং তিনি ব্রহ্মার মুখকমল দ্বারা মূল গীতা জ্ঞান তথা সহজ রাজযোগের শিক্ষা দান করছেন। যাঁরা এই জ্ঞান ধারণ করেন তাঁদের পবিত্র ব্রাহ্মণ বলা হয়। এই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, সরস্বতী এঁদের 'শিব শক্তি' ও বলা হয়ে থাকে - প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা (জ্ঞান দ্বারা) - উৎপন্ন হয়েছেন। এই ছোট যুগকে **'সঙ্গমযুগ'** বলা হয়ে থাকে। এই যুগকে সৃষ্টির **'ধর্মযুগ'** (Leap Yuga) বলা হয় এবং একেই **'পুরুষোত্তম যুগ'** অথবা **'গীতা যুগ'** ও (Gita Epoch) বলা হয়।

সত্যযুগে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের অটল, অখন্ড, নির্বিঘ্ন এবং অতি সুখদায়ক রাজ্য ছিল। বলা হয়ে থাকে যে এই সময়ে ভারতে ঘি-দুধের নদী বয়ে যেত এবং বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল পান করত। ঐ সময়ের ভারতীয়রা দ্বি-মুকুটধারী (Double Crowned) ছিল। সবাই সদাস্বাস্থ্যবান (Ever-healthy) সদাধনবান (Ever-wealthy) ও সদা সুখী (Ever-happy) ছিল। ঐ সময় কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি বিকার এবং যুদ্ধ অথবা হিংসা ও দুঃখের নাম গন্ধও ছিল না। ঐ সময় ভারতকে 'স্বর্গ', 'বৈকুণ্ঠ', 'সুখধাম', অথবা হেভেনলী এবোড্ (Heavenly Abode) বলা হত। ঐ সময় সবাই জীবন্মুক্ত এবং পূজ্য ছিল, এবং গড় আয়ু প্রায় ১৫০ বৎসর ছিল। ঐ যুগের ব্যক্তিদের 'দেবতা বর্ণ' বলা হত। পূজ্য বিশ্ব মহারানি শ্রীলক্ষ্মী তথা পূজ্য বিশ্ব মহারাজা শ্রীনারায়ণের সূর্যবংশে মোট আটজন সূর্যবংশী মহারানি তথা মহারাজা ছিলেন যাঁরা ১২৫০ বৎসর চক্রবর্তী রাজা রূপে রাজত্ব করে গেছেন।

ত্রেতাযুগের চন্দ্রবংশী শ্রীসীতা ও শ্রীরাম ১৪ কলা পূর্ণ গুণবান ও সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। ভারতে তাঁদের রাজত্বকালেরও অনেক মহিমা আছে।

সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের 'আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম' বংশই এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপ বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড যা থেকে পরে অনেক ধর্মরূপী শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে। দ্বাপরে 'দেহ - অভিমান' তথা কাম, ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব হয়। আসুরী স্বভাব ক্রমে ক্রমে দৈবী স্বভাবের স্থান নিতে আরম্ভ করল। সৃষ্টিতে দুঃখ ও অশান্তির রাজ্য শুরু হল। এর থেকে বাঁচার জন্য মানুষ পূজা তথা ভক্তিও শুরু করল। এর থেকে যজ্ঞ, তপ্ ইত্যাদির সৃষ্টি হল।

কলিযুগে লোকে পরমাত্মা শিব তথা দেবতাগণের পূজা ছাড়াও সূর্য, অশ্বত্থ - বৃক্ষ, অগ্নি ও অন্যান্য জড় তত্ত্বের পূজা শুরু করে এবং সম্পূর্ণ দেহ-অভিমানী, বিকারী ও পতিত হয়ে যায়। তাদের আচার-ব্যবহার, দৃষ্টি-বৃত্তি, মন-বচন ও কর্ম ক্রমে ক্রমে তমোগুণী ও বিকারযুক্ত হয়ে গেল।

# সৃষ্টিরূপী কল্পতরু বিপরীতমুখী ও তার বীজ পরমাত্মা

# প্রভু মিলনের যুগ – পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ

# প্রভু মিলনের যুগ — পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ

ভারতে আদি সনাতন ধর্মের লোকেরা যেমন বিভিন্ন উৎসব, পর্ব ইত্যাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মানে তেমনি পুরুষোত্তম মাসকেও মানে। এই মাসকে লোকে তীর্থযাত্রার বিশেষ মাস বলে মানে এবং দান-পুণ্যাদি করে তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চার জন্য যথেষ্ট সময়ও দেয়। তারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করা খুবই পুণ্যের কাজ বলে মনে করে।

বাস্তবে পুরুষোত্তম শব্দ পরমপিতা পরমাত্মারই বাচক। যেমন আত্মাকে 'পুরুষ'ও বলা হয়ে থাকে তেমনি পরমাত্মার 'পরমপুরুষ' অথবা 'পুরুষোত্তম' শব্দের প্রয়োগ হয় কারণ তিনি সকল পুরুষ (আত্মা) থেকে জ্ঞান, শান্তি, পবিত্রতা ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। পুরুষোত্তম মাস কলিযুগের শেষ ও সত্যযুগের আগমনের সঙ্গমযুগের স্মরণ করিয়ে দেয় কারণ এই যুগেই পুরুষোত্তমের (পরমপিতা পরমাত্মার) অবতরণ হয়ে থাকে। সত্যযুগের আরম্ভ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত মনুষ্য আত্মার জন্ম থেকে পুনর্জন্ম হতে থাকে। পরন্তু কলিযুগের শেষে সত্যযুগ ও সত্যধর্মের তথা উত্তম মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষোত্তমকে (পরমাত্মাকে) আসতে হয়। এই সঙ্গম যুগে পরমপিতা মনুষ্যাত্মাদের জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে পরমধামে (ব্রহ্মলোকে) ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অন্যান্য মনুষ্যাত্মাকে সৃষ্টির মহাবিনাশের দ্বারা অশরীরী করে মুক্তিধামে নিয়ে যান। এই প্রকারে সকল মনুষ্যাত্মা শিবপুরী বা বিষ্ণুপুরীর অব্যক্ত ও আধ্যাত্মিক যাত্রা করে এবং জ্ঞান চর্চা বা জ্ঞান গঙ্গায় স্নান করে পাবন বা পবিত্র হয়। কিন্তু লোকে আজ এই রহস্য না জানার জন্য গঙ্গা নদীতে স্নান করে এবং শিব ও বিষ্ণুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থূল যাত্রা করে। বাস্তবে পুরুষোত্তম মাসে যে দানের মহত্ব আছে তা হল পাঁচ বিকারের দান। পরমপিতা পরমাত্মা যখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অবতরিত হন তখন পাঁচ বিকারের দান দেওয়ার (ত্যাগ করার) শিক্ষা দেন। এই প্রকারে মানুষ কাম, ক্রোধাদি বিকারের ত্যাগ করে উত্তম মর্যাদা সম্পন্ন হয় এবং তারপর সত্যযুগ, দেবযুগ অথবা কৃতযুগের আরম্ভ হয়। আজ যদি এই রহস্য জেনে মানুষ বিকার দান করে দেয়, জ্ঞান গঙ্গায় নিত্য স্নান করে এবং যোগ দ্বারা দেহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিক যাত্রা করে তাহলে পৃথিবীতে পুনরায় সুখ-শান্তি সম্পন্ন রাম-রাজত্বের (স্বর্গ) স্থাপনা হয় এবং নর ও নারী নরক থেকে উত্থিত হয়ে স্বর্গে পৌঁছে যাবে। চিত্রে এই রহস্য দেখান হয়েছে।

এখানে সঙ্গমযুগে শুভ্র পোশাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, জগদম্বা, সরস্বতী তথা কিছু মুখ্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীদের পরমপিতা, পরমাত্মা শিবের সাথে যুক্ত হতে যোগ দেখা যাচ্ছে। এই রাজযোগ দ্বারাই মনের মালিন্য ধৌত হয়, পুরোনো বিকর্ম দগ্ধ হয় এবং সংস্কার সতোপ্রধান হয়। এখানে নীচের দিকে নরকের মনুষ্যদের জ্ঞান এবং যোগ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকারকে এই যোগ অগ্নিতে স্বাহাঃ করতে দেখা যাচ্ছে। এরই ফলস্বরূপ তারা নর থেকে শ্রীনারায়ণ, নারী থেকে শ্রীলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হয়ে অর্থাৎ **'মনুষ্য থেকে দেবতা'** পদ প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে সুখধাম বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গে পবিত্র এবং সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি সম্পন্ন স্বরাজ্যের অধিকারী হয়েছে।

স্মরণীয় যে বর্তমান সময়ে এই সঙ্গমযুগই চলছে। **এই কলিযুগী সৃষ্টি নরক অর্থাৎ দুঃখধাম শেষ হয়ে অদূর ভবিষ্যতে সত্যযুগ আসছে যখন এই সৃষ্টি সুখধামে পরিণত হবে।** অতএব এখন আমাদের পবিত্র যোগী জীবন ধারণ করতে হবে।

# মানুষের ৮৪ জন্মের অদ্ভুত কাহিনি

মনুষ্যাত্মা সারা কল্পের মধ্যে সর্বাধিক ৮৪ বার জন্ম নেয়। সে ৮৪ লক্ষ যোনিতে পুনর্জন্ম নেয় না। মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্মের চক্রকেই এখানে ৮৪টি সিঁড়ি রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও জগদম্বা সরস্বতী মনুষ্য সমাজের আদি পিতা ও আদি মাতা সেজন্য তাঁদের ৮৪ জন্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করলে অন্য মনুষ্যাত্মাগণও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্রহ্মা ও সরস্বতী সঙ্গমযুগে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের দেওয়া জ্ঞান ও যোগের মাধ্যমে সত্যযুগের আরম্ভে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীলক্ষ্মীর পদ প্রাপ্ত হন।

## সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগে ২০ জন্মের পূজ্য দেবপদ

এখানে চিত্রে দেখান হয়েছে সত্যযুগে ১২৫০ বৎসর পর্যন্ত শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণ ১০০ প্রতিশত সুখ-শান্তি সম্পন্ন ৮ বার জন্ম নেন। এজন্য ভারতে ৮ সংখ্যাকে শুভ মানা হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি কেবল ৮ বীজের মালা জপ করতে থাকে তথা অষ্টদেবতার পূজাও করে। পূজ্যপাদ এই অষ্ট নারায়ণের জন্ম ৮টি সিঁড়ির রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পরে ত্রেতা যুগে ১২৫০ বৎসর মোট ১৪ কলা সম্পন্ন শ্রীসীতা ও শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে পূজ্য রাজারানি অথবা উচ্চশ্রেণির প্রজারূপে মোট ১২ জন্ম নেন। এই প্রকারে সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগে মোট ২৫০০ বৎসরের সম্পূর্ণ পবিত্রতা সুখ-শান্তি এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন ২০টি দৈবী জন্ম হয়।

## দ্বাপর ও কলিযুগে ৬৩ জন্মের বন্ধন

পরে সুখের প্রারব্ধ শেষ হবার পর সেই 'আত্মা' দ্বাপর যুগে প্রথমে পূজ্য থেকে পূজারীর স্থিতিতে পরিবর্তিত হয়। তখন সর্বপ্রথমে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিবের হীরার মূর্তি তৈরি করে অনন্য ভাবনায় তাঁর পূজা করে। এখানে চিত্রে তাকে (দেবাত্মা) এক পূজারি রাজা রূপে দেখান হয়েছে। ধীরে ধীরে সে সূক্ষ্ম দেবতা অর্থাৎ বিষ্ণু ও শংকরের পূজা শুরু করে দেয় এবং পরে অজ্ঞানতা তথা আত্ম বিস্মৃতির জন্য নিজেরই প্রথম শ্রীনারায়ণ ও শ্রীলক্ষ্মী রূপের পূজা শুরু করে দেয়। এজন্য কিংবদন্তী প্রসিদ্ধি আছে যে, যে স্বয়ং কোন সময় পূজ্য ছিল সে পরবর্তী কালে নিজেই নিজের পূজারী হয়েছে। শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের আত্মা দ্বাপরযুগে ১২৫০ বৎসরে এইরূপ পূজারী স্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপে বৈশ্য বংশী ভক্ত শিরোমণি রাজা, রানি অথবা সুখী প্রজা রূপে মোট ২১ জন্ম নেয়।

এর পর কলিযুগের শুরু। এই সময়ে সূক্ষ্মলোক তথা সাকার লোকের দেবদেবীর পূজা ছাড়াও তত্ত্বের পূজা শুরু হয়ে যায়। এই অবস্থা সৃষ্টির তমোপ্রধান অথবা শূদ্র অবস্থা। এই সময় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার উগ্ররূপ ধারণ করতে থাকে। কলিযুগের শেষে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণ বা তাঁদের বংশের অন্যান্য আত্মারা মোট ৪২ জন্ম নেয়।

## সঙ্গমযুগে একটি মরজীবা জন্ম

এখন পর্যন্ত তাঁরা পুরো ৮৩ বার জন্ম নিয়ে নিয়েছেন। ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা এখন তাঁদের অন্তিম অর্থাৎ ৮৪ তম জন্ম। ঈশ্বরীয় মত মেনে তাঁরা 'নবজীবন' পেয়েছেন, তাই তাঁদের ইহা 'মরজীবা' জন্ম। এই অবস্থায় পরমপিতা শিব তাঁর নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা অথবা তাঁর মুখবংশী কন্যার নাম 'জগদম্বা সরস্বতী' রেখেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে মোট ৫০০০ বৎসরের মধ্যে তাঁদের দুজনের আত্মা পূজ্য ও পূজারীরূপে ৮৪ বার জন্ম নেয়। এরূপে দেবতা বংশের অন্য আত্মারাও ৫০০০ বৎসরের মধ্যে সর্বাধিক ৮৪ বার জন্ম নেয়। এজন্য ভারতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে 'চুরাশির চক্র' নামেও অভিহিত করা হয় এবং কোন কোন দেবীর মন্দিরে ৮৪টি ঘন্টাও লাগান থাকে তথা তাঁকে (দেবীকে) ৮৪ ঘন্টাওয়ালা দেবী সম্বোধনে স্মরণ করে থাকে।

# মনুষ্য আত্মার ৮৪ জন্মের অদ্ভুত কাহিনী

# মনুষ্যাত্মা ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে না

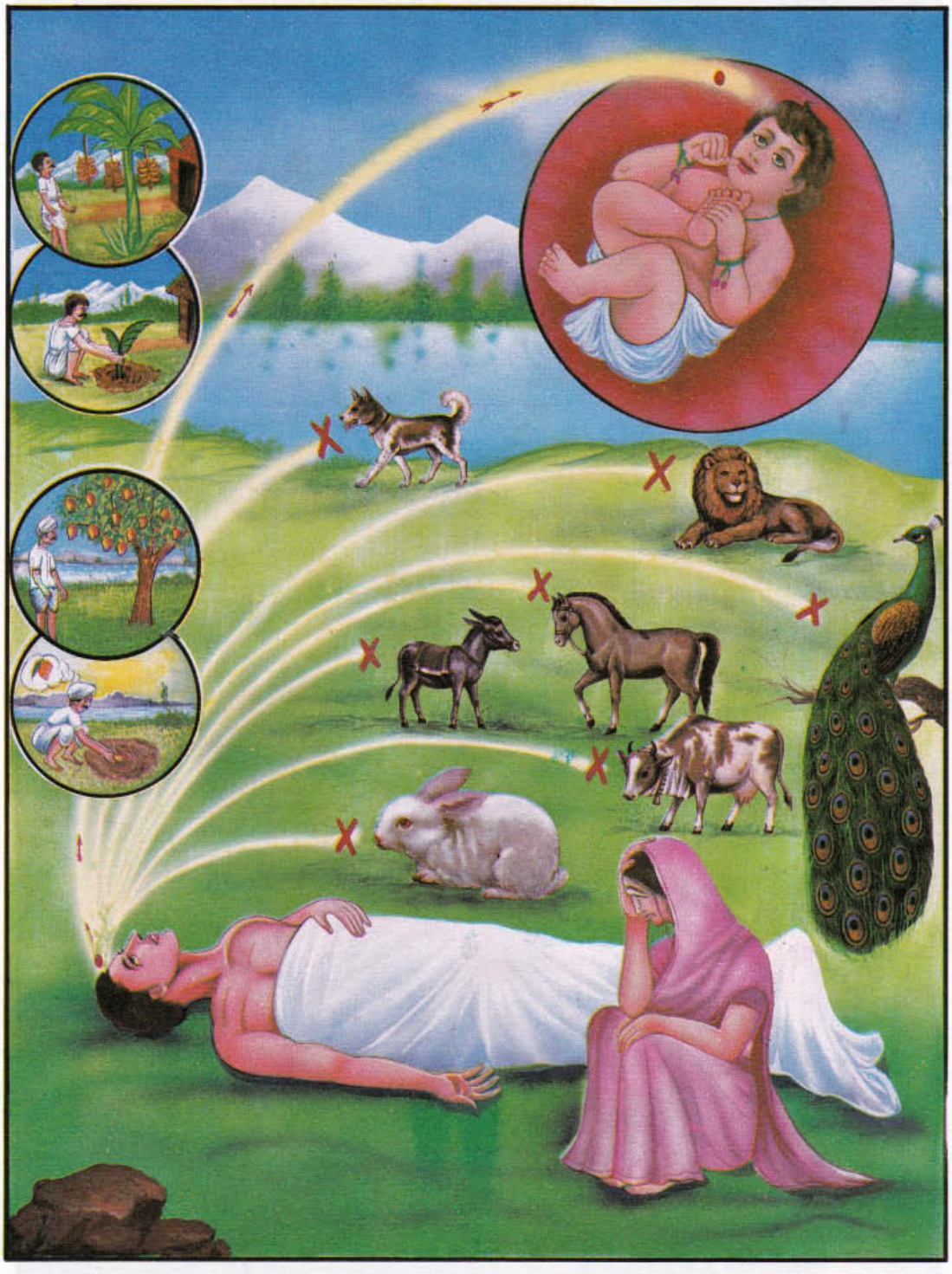

# মনুষ্যাত্মা ৮৪ লক্ষ যোনি ধারণ করে না

পরমপ্রিয় পরমপিতা পরমাত্মা শিব বর্তমান সময়ে আমাদের ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক গহন রহস্য যেমন বুঝিয়েছেন তেমনি একটি নতুন কথাও শুনিয়েছেন যে বাস্তবে মনুষ্য আত্মা পশুযোনিতে জন্ম নেয় না। আমাদের পক্ষে এটি এক আনন্দের খবর। তথাপি এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা বলে মনুষ্য আত্মা পশু পাখি ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনিতে জন্ম ও পুনর্জন্ম নেয়।

তারা বলে — "যেমন কোন দেশের সরকার অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য তার স্বতন্ত্রতা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি ঘরে বন্ধ রাখে এবং কিছু সময়ের জন্য সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, তেমনি মানুষও যদি কোন কুকর্ম করে তাহলে তাকে দণ্ড স্বরূপ পশু পাখির যোনিতে দুঃখ তথা পরাধীনতার দুর্ভোগ ভুগতে হয়।"

জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিব বুঝিয়েছেন, মনুষ্য আত্মা নিজের কুকর্মের দণ্ড নিজের যোনিতেই ভোগ করে। পরমাত্মা বলছেন, মানুষ মন্দ গুণ-কর্ম-স্বভাবের জন্য পশুর চেয়েও হীন হয়ে যায় এবং পশু পাখি অপেক্ষাও অনেক বেশি দুঃখী হয় কিন্তু মানুষ কখনও পশু পাখির যোনিতে জন্ম নেয় না। এজন্য আমরা দেখি এবং শুনেও থাকি যে মানুষ বোবা, অন্ধ, কালা, খোঁড়া, কুষ্ঠ ও চিররুগ্ন তথা কাঙাল হয় এবং আরও দেখতে পাই যে কোন কোন পশু পাখি মানুষের থেকেও বেশি স্বাধীন ও সুখী। তাদের (যথা কুকুরকে) পাঁউরুটি-মাখন খাওয়ান হয় এবং শোফাতে শুতে দেওয়া হয়, মোটর গাড়ীতে চড়ান হয় এবং অনেক আদর যত্নের সাথে পালন করা হয়। কিন্তু এমন অনেক মানুষ এ সংসারে আছে যারা ক্ষুধার্ত ও অর্ধনগ্ন জীবন যাপন করে এবং যখন তারা একটি দুটি পয়সার জন্য হাত পাতে তখন লোকে তাদের অপমান করে। কত মানুষ শীতে কাঁপতে কাঁপতে অথবা রুগ্ন অবস্থায় রাস্তার পাশে কুকুরের চেয়েও অধম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে ও কত লোকই তো অত্যন্ত বেদনা ও দুঃখের জন্য নিজের হাতে নিজেকেই শেষ করে ফেলে। অতএব আমরা যখন দেখতে পাই যে মনুষ্য যোনিও ভোগের যোনি এবং মনুষ্য যোনিতে মানুষ পশু অপেক্ষাও অধিক দুঃখী হতে পারে তখন একথা কীভাবে মানা যায় যে মনুষ্য আত্মা পশু পাখি ইত্যাদি যোনিতে জন্ম নেয়?

## যেমন বীজ তেমন বৃক্ষ

এছাড়া প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার মধ্যে নিজের জন্ম জন্মান্তরের পার্ট অনাদি কাল থেকে অব্যক্ত রূপে নিহিত আছে এবং এজন্য আত্মাগণ অনাদি কাল থেকে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন গুণ-কর্ম-স্বভাব-প্রভাব ও প্রালব্ধের অধীন। মনুষ্য আত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাব তথা পার্ট (part) অনাদি কাল থেকে অন্য যোনির আত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাব থেকে ভিন্ন। অতএব আমের আঁটি থেকে কখনই লঙ্কা জন্মাতে পারে না কারণ "যেমন বীজ তেমন বৃক্ষ" ঠিক তেমনই মনুষ্য আত্মার শ্রেণিও পৃথক হয়। মনুষ্য আত্মা পশু পাখি ইত্যাদি ৮৪ লাখ যোনিতে জন্ম নেয় না। অধিকন্তু মনুষ্য আত্মা এক কল্পে মনুষ্য যোনিতেই সর্বাধিক ৮৪ বার জন্ম, পুনর্জন্ম নিয়ে আপন কর্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে।

## যদি মনুষ্যাত্মা পশু যোনিতে জন্ম নিত তাহলে সংখ্যায় (গণনায়) মানুষ বেড়ে যেত না

একটু অনুধাবন করলেই অনুভব হয়, যদি কুকর্মের জন্য মনুষ্য আত্মার জন্ম পশুযোনিতে হত তাহলে প্রতি বৎসর আদম সুমারিতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেত না বরং কমে যেত। কারণ আজ সবার কর্ম বিকারের জন্য বিকর্ম বা অপকর্মে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও দেখা যায় যে সংখ্যায় মানুষ বেড়েই চলেছে কারণ মানুষ পশুপাখি কীট পতঙ্গের যোনিতে জন্ম নেয় না।

# ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়

## (যেখানে জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান দান করেন)

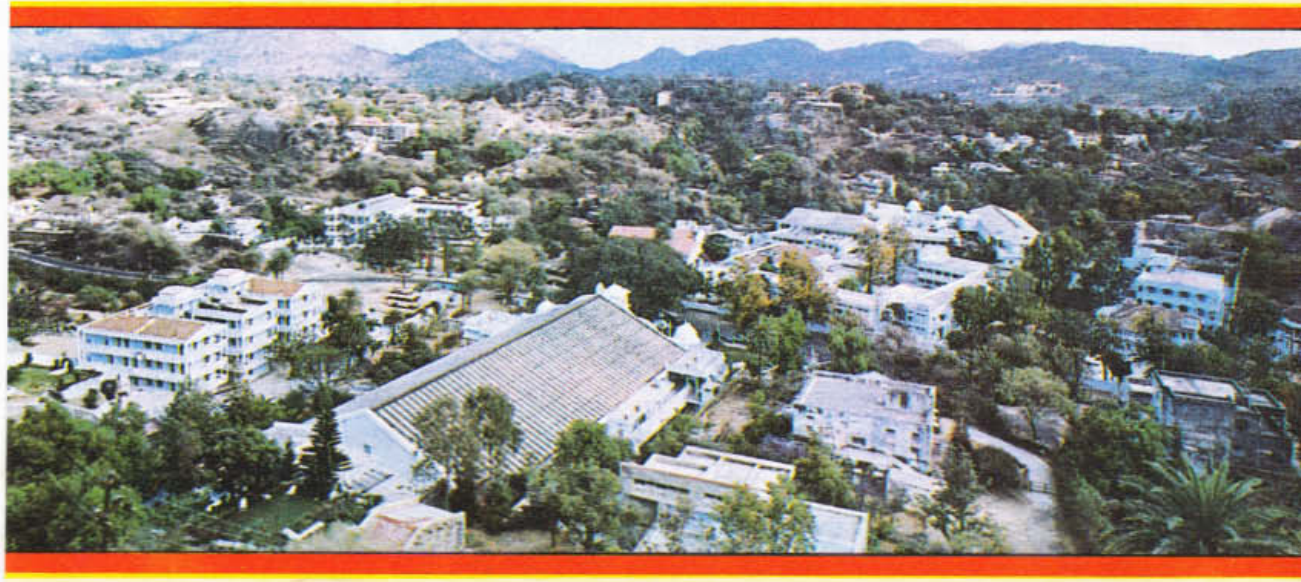

(প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মুখ্যালয় আবু পর্বত। বর্তমানে ইহার ১৩৭ দেশে প্রায় ৯০০০ অধিক 'জ্ঞান ও যোগের' কেন্দ্র আছে)

এই পথ-প্রদর্শক বইয়ের মধ্যে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের বিষয়ে লেখা হয়েছে তার বিস্তারিত শিক্ষা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। উপরে যে চিত্র দেওয়া হয়েছে সেটি এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের মুখ্য শিক্ষা কেন্দ্র তথা কার্যালয়। এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনা পরমপ্রিয় পরমাত্মা জ্যোতির্বিন্দু শিব ১৯৩৭ সালে সিন্ধে (সিন্ধু প্রদেশে) করেছিলেন। পরমপিতা শিব পরমধাম অর্থাৎ ব্রহ্মালোক থেকে অবতরিত হয়ে এক সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবিষ্ট অথবা সন্নিবিষ্ট হয়েছিলেন। কেননা কোন মানুষের মুখের সাহায্য ছাড়া তিনি (পরমাত্মা) আর কোন উপায়ে জ্ঞানই-বা শোনাবেন?

জ্ঞান এবং সহজ যোগ দ্বারা সত্যযুগের স্থাপনার জন্য জ্যোতি-বিন্দু শিব যে ব্যক্তির শরীরে 'দিব্য প্রবেশ' বা 'দিব্য জন্ম' গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তিকে তিনি 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা' এই অলৌকিক নামে আখ্যায়িত করেন। এই ব্রহ্মার মুখ দ্বারা জ্ঞান এবং যোগের শিক্ষা নিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন তথা পূর্ণ পবিত্রতার ব্রত যে নর অথবা নারী পালন করেন তাঁকেই ক্রমশঃ ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী অথবা ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী বলা হয় কারণ এঁদের আধ্যাত্মিক নবজীবন ব্রহ্মার শ্রীমুখ নিঃসৃত জ্ঞান থেকেই জন্ম নেয়।

পরমপিতা শিব ত্রিকালদর্শী। তিনি যে শরীরের আধার নেন সেই ব্যক্তি তথা প্রজাপিতা ব্রহ্মার জন্ম-জন্মান্তরের জীবন কাহিনি জানতেন যে ইনিই সত্যযুগে পূজ্য শ্রীনারায়ণ ছিলেন এবং সময়ান্তরে কলা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং পরমাত্মা এঁর (ব্রহ্মা) শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞের অথবা ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ৫০০০ বৎসরের পুরোনো রাজযোগের পুনস্থাপনা করলেন। এই ব্রহ্মাকে 'প্রজাপিতা' মহাভারতের ভাষায় 'ভগবানের রথ' এই নামে অভিহিত করা যেতে পারে। 'জ্ঞান গঙ্গা' নিয়ে আসার জন্য ইনিই নিমিত্ত ছিলেন এবং এঁকেই শিবের বাহন নন্দীগণ বলা যায়।

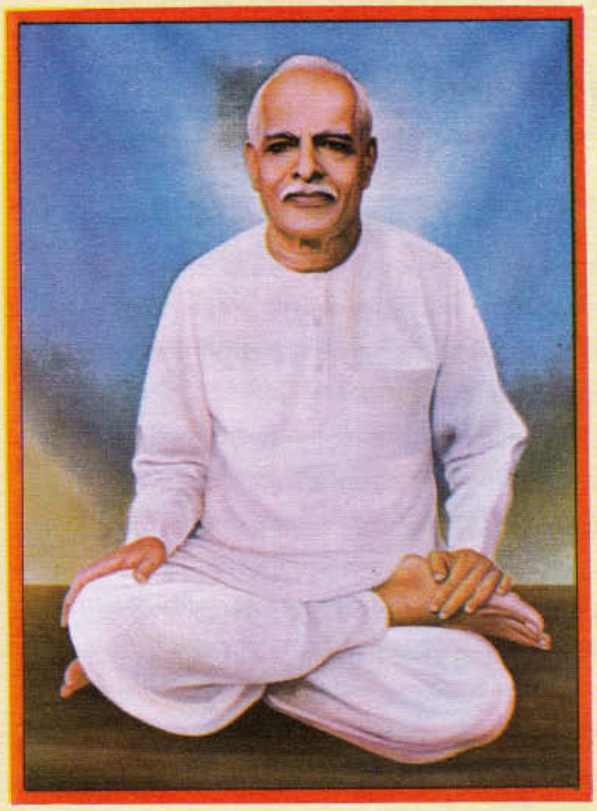

## পিতাশ্রী ব্রহ্মা

**(যাঁর মাধ্যমে পরমপিতা শিব জ্ঞান দান করেছেন)**

যাঁর শরীরে পরমাত্মা শিব প্রবিষ্ট হয়েছিলেন তিনি সেই সময়ে কলকাতার এক বিখ্যাত জহুরী ছিলেন এবং তিনি শ্রীনারায়ণের অনন্য ভক্ত ছিলেন। তাঁর মধ্যে উদারতা, সকলের প্রতি কল্যাণ ভাবনা, অমায়িক ও মধুর ব্যবহার, রাজকুলোচিত শালীনতা এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির এক অদম্য কামনা ছিল। তাঁর পরিচয়, সম্বন্ধ ও কার্য-ব্যবহার রাজা মহারাজাদের সাথে এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যেমন ছিল তেমনি সাধারণ ব্যক্তি ও নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিদের সাথেও তাঁর খুব পরিচয় ও প্রেম ছিল। অতএব তিনি অনুভবীও ছিলেন এবং সেই সময়েও তাঁর মধ্যে ছিল ভক্তির পরাকাষ্ঠা তথা বৈরাগ্যের অনুকূল স্থিতি।

তাছাড়া প্রবৃত্তিকে (কার্য ব্যবহার) দিব্য করার জন্য মাধ্যমও প্রবৃত্তি মার্গের ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল।

## জগদম্বা সরস্বতী

**(যিনি জ্ঞান-বীণার দ্বারা আত্মিক জাগরণ এনেছিলেন)**

এজন্য অন্যান্য অনেক কারণে ত্রিকালদর্শী পরমপিতা শিব তাঁর (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেন।

তাঁর (ব্রহ্মা) মুখ নিঃসৃত জ্ঞান এবং যোগের শিক্ষা গ্রহণে রত সকল ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁর এই অলৌকিক জীবনের নাম হয় জগদম্বা সরস্বতী। তিনিই 'যজ্ঞ-মাতা' মনোনীত হন। তিনি জ্ঞান বীণা দ্বারা জনে জনে প্রভুর পরিচয় দান করে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জাগৃতি আনেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন এবং সহজ রাজযোগের দ্বারা অনেক মনুষ্যাত্মার 'জীবন-জ্যোতি' প্রজ্জ্বলিত করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বা সরস্বতী মনুষ্য জাতির নিকট পবিত্র এবং দৈবী জীবনের আদর্শ উদাহরণ রূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

# সৃষ্টি-নাটকের রচয়িতা ও নির্দেশক কে?

এই মনুষ্য সৃষ্টি 'প্রকৃতি ও পুরুষের' এক অনাদি খেলা। এর রহস্য জানতে পারলে মনুষ্যাত্মা প্রভূত আনন্দ লাভ করতে পারে।

## সৃষ্টিরূপী নাটকের চার অধ্যায়

পাশের চিত্রে দেখান হয়েছে 'স্বস্তিকা' সৃষ্টি চক্রকে চারটি সমান ভাবে বিভক্ত করেছে — সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ।

সৃষ্টি-নাটকে প্রতিটি মনুষ্যাত্মা পরমধাম থেকে এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে এক নির্দিষ্ট সময়ে আসে। সর্বপ্রথমে সত্য ও ত্রেতাযুগের সুন্দর দৃশ্য সামনে আসে ও এই দুই যুগের সুখপূর্ণ সৃষ্টির পৃথিবী-মঞ্চে এক 'আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম-বংশের' মনুষ্যাত্মাদেরই পার্ট হয় এবং অন্য সকল ধর্ম-বংশের আত্মারা পরমধামে থাকে। অর্থাৎ এই-দুই যুগে কেবল এই দুই বংশের মনুষ্যাত্মারাই নিজের নিজের পবিত্রতার স্তর অনুসারে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে। এজন্য এই দুই যুগে সকলেই অদ্বৈত ও বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাবের হয়।

দ্বাপর যুগে এই ধর্মেরই রজোগুণী অবস্থা হওয়ার জন্য ইব্রাহিম দ্বারা ইসলাম ধর্ম-বংশ, বুদ্ধ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম-বংশ এবং ঈশা (যিশু) দ্বারাই ঈশাই (খ্রীষ্টান) ধর্ম-বংশের স্থাপনা হয়। অতএব এই চার মুখ্য ধর্ম-বংশের পিতারাই এই সংসারে মুখ্য অভিনেতা (Principal Actors) এবং এই চার ধর্মের শাস্ত্রই মুখ্য শাস্ত্র। এছাড়া, সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপক শংকরাচার্য, মুসলমান (মুহম্মদী) ধর্ম-বংশের স্থাপক মুহম্মদ ও শিখ ধর্মের স্থাপক নানকও এই বিশ্ব-নাটকে মুখ্য অভিনেতাদের পর্যায়ে। তৎসত্ত্বেও পূর্বে বর্ণিত প্রধানতঃ চার ধর্মের উপরই ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্ব নাটক আবর্তিত। এই সকল নানাপ্রকার মত মতান্তরের জন্য দ্বাপর যুগ তথা কলিযুগী সৃষ্টিতে দ্বৈত ভাব, লড়াই ঝগড়া তথা দুঃখ হয়।

কলিযুগের অন্তে যখন ধর্মের অতি গ্লানি হয় অর্থাৎ বিশ্বের সর্বপ্রথম সনাতন দেবীদেবতা ধর্ম অতি ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য অত্যন্ত পতিত হয়ে যায় তখন এই সৃষ্টি নাটকের রচয়িতা তথা নির্দেশক (Creator Director) পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে স্বয়ং অবতরিত হন। তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মুখবংশী কন্যা ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী তথা অন্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীদের সৃষ্টি করেন এবং তাদের দ্বারা পুনরায় সবার সঙ্গে মাতা পিতা রূপে মিলিত হন তথা জ্ঞান দ্বারা তাদের সত্যের পথ প্রদর্শন করেন। এবং তাদের মুক্তি তথা জীবন্মুক্তির ঈশ্বরীয় জন্ম সিদ্ধ অধিকার দান করেন। অতএব প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও জগদম্বা সরস্বতী, যাঁদের 'এ্যাডম্' ও 'ইভ্' অথবা 'আদম' ও 'হব্বা' বলা হয়ে থাকে, এই সৃষ্টি নাটকের নায়ক নায়িকা, কারণ তাঁদের দ্বারাই স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা শিব এই পৃথিবীতে স্বর্গের স্থাপনা করেন। কলিযুগের শেষ ও সত্যযুগের শুরুর স্বল্প সন্ধিক্ষণই 'সঙ্গমযুগ' অর্থাৎ পরমাত্মা যখন অবতরণ করেন, খুবই মহত্ত্বপূর্ণ।

## বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোলের পুনরাবৃত্তি

চিত্রে এটাও দেখান হয়েছে যে কলিযুগের শেষে পরমপিতা পরমাত্মা শিব যখন মহাদেব শংকরের দ্বারা সৃষ্টির মহাবিনাশ করান তখন প্রায় সকল আত্মারূপী অভিনেতা (actor) নিজেদের প্রিয় দেশ অর্থাৎ মুক্তিধামে ফিরে যায় এবং পুনরায় সত্যযুগের শুরু থেকে 'আদি সনাতন দেবী দেবতা' ধর্মের মুখ্য মনুষ্যগণ এই সৃষ্টি মঞ্চে আসতে শুরু করে। পুনরায় ২৫০০ বৎসর পরে দ্বাপর যুগের আরম্ভ থেকে ইব্রাহিমের ইসলাম পরিবারের আত্মাগণ, তারপর বৌদ্ধ ধর্মের ও আরও পরে ঈশাই (খ্রীষ্টান) ধর্ম-বংশের আত্মাগণ নিজ নিজ সময়ে সৃষ্টিমঞ্চে পুনরায় এসে নিজের নিজের অনাদি-নিশ্চিত পার্ট-অভিনয় করতে থাকে এবং সুবর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, তাম্রযুগ ও লৌহযুগ এই চার যুগের অবস্থা পার হয়ে আসে। এইরূপে এই অনাদি-নিশ্চিত সৃষ্টি নাটক অনাদি কাল থেকে প্রতি ৫০০০ বৎসর অন্তর হুবহু পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

সৃষ্টিরূপী নাটকের রচয়িতা ও নির্দেশক কে?

# কলিযুগ এখন অন্তিম সময়ে উপনীত

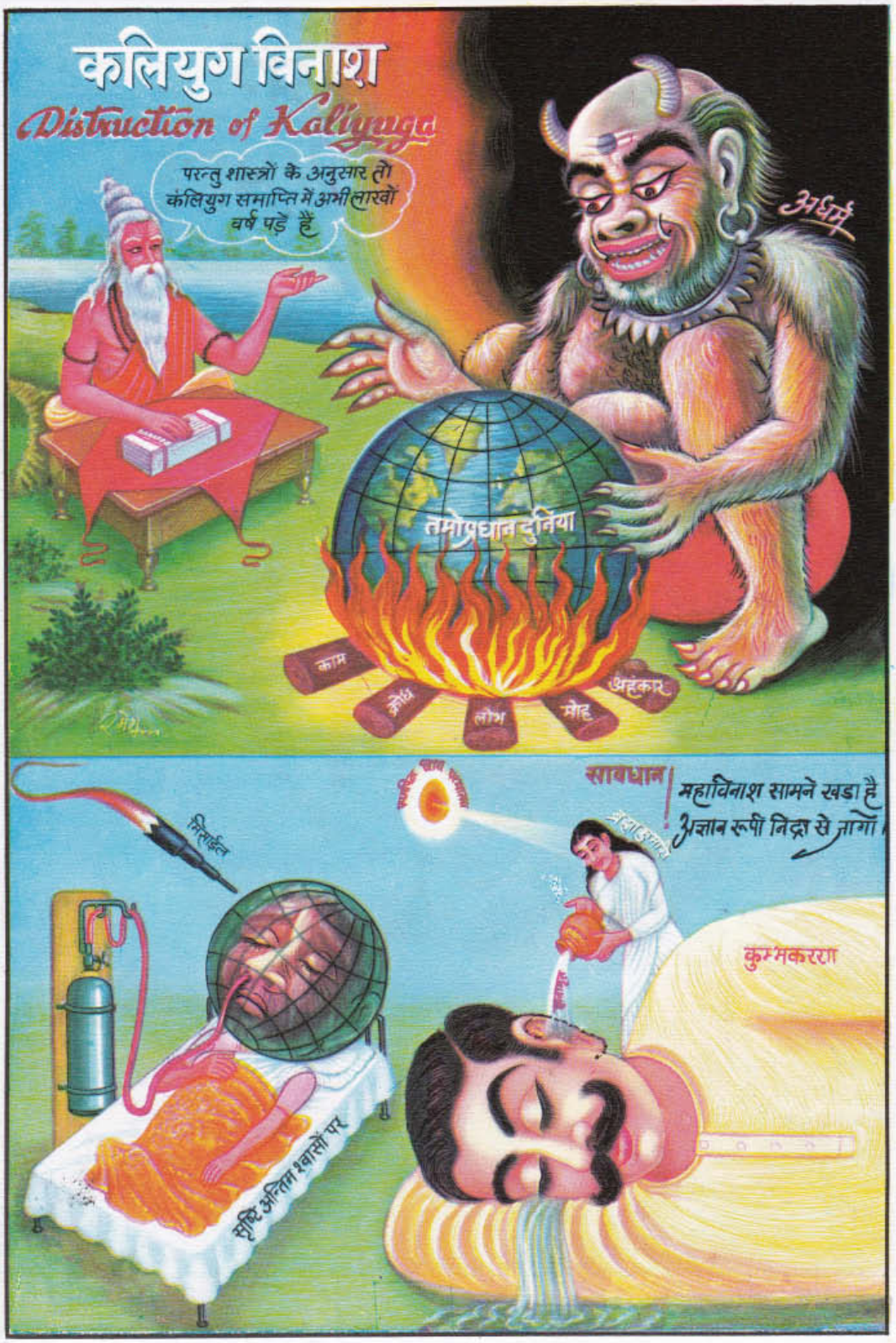

# কলিযুগ এখন শৈশবে নয় বরং বার্ধক্যে পৌঁছেছে
## (কলিযুগের বিনাশ অতি সন্নিকট এবং শীঘ্রই সত্যযুগ আসছে)

আজ বহুলোকে বলে, "কলিযুগ এখনও শিশুকালে রয়েছে। এখনও এর আয়ু লক্ষ বৎসর বাকি এবং শাস্ত্র অনুযায়ী এখনও এই সৃষ্টির মহাবিনাশের বহুকাল বাকি আছে।"

কিন্তু এখন পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন যে কলিযুগ বার্ধক্য দশায় পৌঁছেছে। এখন সৃষ্টির মহাবিনাশের সময় নিকটে এসে গেছে। এখন সকলে দেখতেও পাচ্ছে যে এই মনুষ্য-সৃষ্টি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ তথা অহংকারের চিতায় জ্বলছে। সৃষ্টির মহাবিনাশের জন্য এ্যাটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমা তথা মিসাইল (Missile) তৈরি হয়ে আছে। এখনও যদি কেউ বলে যে মহাবিনাশ অনেক দূরে তাহলে সে ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে এবং কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শুয়ে আছে। তারা এভাবে নিজেদের অকল্যাণ করছে। এখন যেহেতু পরমপিতা পরমাত্মা শিব অবতরিত হয়ে জ্ঞানামৃত পান করাচ্ছেন, সুতরাং ঐ সব ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

আজ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরাও বলছেন যে জনসংখ্যা যেরূপ তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে, খাদ্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ছে না। সেজন্য তাঁরা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিণাম স্বরূপ মহাবিনাশের আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন। উপরন্তু, পরিবেশ দূষণ তথা কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি সব শক্তির উপাদান কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবার সতর্কবাণীও বৈজ্ঞানিকেরা করে চলেছেন। আবার অনেকে হিম-পাত ও হিম-বাহের মাধ্যমে পৃথিবী শীতল হয়ে যাবার আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। আজ কেবলমাত্র রাশিয়া ও আমেরিকার নিকটই ১২ লক্ষ টন পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে। সর্বোপরি আজকের জীবন এমন বিকারী এবং অশান্তিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যে এখনও কলিযুগের আয়ু কোটি কোটি বৎসর আছে মনে করার অর্থ উপরোক্ত সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকা। কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত যে পরমাত্মা অধর্মের মহাবিনাশ করে দৈবী ধর্মের পুনঃস্থাপনাও করছেন।

অতএব সকলের একথা জানা প্রয়োজন যে এখন পরমপ্রিয় পরমপিতা পরমাত্মা শিব সত্যযুগী পবিত্র এবং দৈবী সৃষ্টির পুনঃস্থাপনা করাচ্ছেন। তিনি মানুষকে দেবতা অর্থাৎ পতিতকে পাবন (পবিত্র) করছেন। সুতরাং এখন তাঁর দ্বারা সহজ রাজযোগ ও জ্ঞান — এই অমূল্য বিদ্যা শিক্ষা করে জীবনকে পবিত্র, সতোপ্রধান দৈবী তথা আনন্দময় করার সর্বোত্তম পুরুষার্থ করা উচিত। যাঁরা একথা মনে করে বসে আছেন যে কলিযুগের এখনও ৩ লক্ষ বছর বাকি আছে তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্যকে নিজেরাই কুঠারাঘাত করছেন।

এখন কলিযুগী সৃষ্টি অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবং মৃত্যুশয্যার উপরে আছে। সে এখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার-এর রোগে পীড়িত। সুতরাং এই সৃষ্টির আয়ু কোটি কোটি বৎসর মানা ভুল এবং কলিযুগকে এখনও শিশু মনে করে অজ্ঞান-নিদ্রায় শায়িত ব্যক্তিরাই কুম্ভকর্ণ। যে সকল ব্যক্তি এই ঈশ্বরীয় সন্দেশকে এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় তাদের কান কুম্ভের (কলসী) সমান। কারণ কুম্ভ বুদ্ধিহীন।

# সত্যিই কি রাবণের দশটি মাথা ছিল? রাবণ কীসের প্রতীক?

ভারতবাসীগণ প্রতিবৎসরই রাবণের প্রতিমূর্তি (কুশ-পুত্তলিকা) জ্বালায়। তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে দশ-মুন্ড ধারী এক রাবণ লঙ্কার রাজা ছিল; সে এক বিকট রাক্ষস ছিল এবং সে সীতাদেবীকে হরণ করেছিল। তারা এটাও মানে যে রাবণ খুব বড় বিদ্বান ছিল। এজন্য রাবণের হাতে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি দেখান হয়েছে। এর সাথে তার মাথার উপর গাধার মাথা দেখান হয়েছে যার অর্থ করা হয় যে সে একগুঁয়ে ও নির্বোধ ছিল। কিন্তু এখন পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলছেন যে রাবণ কোন দশ-মাথা যুক্ত রাক্ষস বা মনুষ্য ছিল না। রাবণের মূর্তি প্রকৃতপক্ষে অশুভ বিকারের প্রতীক। রাবণের দশ মাথা পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পাঁচ-পাঁচ বিকারের প্রকটতার প্রকাশ এবং তার মূর্তি এমন এক সমাজের প্রতীক যা স্ত্রী-পুরুষকে এইরূপ বিকারী করেছে। এই সমাজের লোকেরা অনেক গ্রন্থ বা শাস্ত্র পড়েছে এবং বিজ্ঞানেও উচ্চ শিক্ষা লাভও করেছে কিন্তু তারা হিংসা ও অন্যান্য বিকারের বশীভূত। তাদের পাণ্ডিত্য তাদের উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তারা মারমুখী ও উগ্রস্বভাবের হয়ে পড়ে এবং ভাল কথায় তাদের কানে তালা লাগান থাকে। 'রাবণ' শব্দের অর্থই হল যে অন্যকে 'রোদন' করায়। অতএব এটি অসৎ কর্মের প্রতীক কারণ কু-কর্মই মানুষের জীবনে অশ্রু ঝরায়। অতএব সীতার অপহরণ কথার ভাব প্রকৃত পক্ষে আত্মার শুদ্ধ ভাবনার অপহরণের সূচক। এইরূপে 'কুম্ভকর্ণ' আলস্য ও 'মেঘনাদ' কটু বচনের প্রতীক। সারা পৃথিবীই এক মহাদ্বীপ অথবা মানুষের মনই 'লঙ্কা'।

এই দৃষ্টিতে বলা যায় যে এই বিশ্বে দ্বাপর যুগ ও কলিযুগে (অর্থাৎ ২৫০০ বৎসর) 'রাবণ রাজ্য' বিরাজ করে কারণ এই দুই যুগে মানুষ 'মায়া' অর্থাৎ বিকারের বশীভূত হয়ে যায়। ঐ সময় অনেক পূজা পাঠ করা তথা শাস্ত্র আদি পড়া সত্ত্বেও মানুষ বিকারী, অধর্মী এবং ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। রোগ, শোক, অশান্তি ও দুঃখের আধিপত্য সর্বত্র বিরাজ করে। মানুষের পান ভোজন অসুরের মত (মাংস-মদ ও তামসিক ভোজন) হয়ে যায়। তারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদি বিকারের বশীভূত হয়ে একে অপরকে দুঃখ দেয় এবং কাঁদাতে থাকে। ঠিক এরই বিপরীত, সুবর্ণ (স্বর্ণ) ও রজত (রৌপ্য) যুগে রামরাজ্য ছিল কারণ পরমাত্মা — যাঁকে রমণীয় অথবা সুখদাতা হবার জন্য 'রাম'ও বলা হয়, সেইরূপ পবিত্রতা, শান্তি এবং সুখ সম্পন্ন দৈবী স্বরাজ্যের পুনঃস্থাপনা করেছিলেন। সেই রাম রাজ্যের বিষয়ে জনশ্রুতি আছে যে সে সময় মধু দুধ-ঘি এর নদী বইত এবং বাঘে-গরুতে একসঙ্গে একঘাটে জল পান করত।

বর্তমান যুগে মনুষ্যাত্মা পুনরায় মায়ায় অর্থাৎ রাবণের প্রভাবের অধীনে আছে। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, প্রভূত ধন-সম্পদ এবং সাংসারিক সুখের সাধন থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃত সুখ ও শান্তি নেই। ঘরে ঘরে কলহ-ক্লেশ, লড়াই-ঝগড়া এবং দুঃখ-অশান্তি তথা ভ্রষ্টাচার, কৃত্রিমতা, অধর্ম ও অসত্যের রাজত্ব চলছে — এজন্যই একে 'রাবণ রাজ্য' বলা হয়।

এখন পরমাত্মা শিব 'গীতা'য় দেওয়া নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সহজ জ্ঞান ও রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন এবং মনুষ্যাত্মাদের মনোবিকার ধ্বংস করে তাদের মধ্যে দৈবী গুণ ধারণ করাচ্ছেন তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে বাপু গান্ধীজির স্বপ্নের রাম-রাজ্যের (রমণীয় রাজত্ব) স্থাপনা করাচ্ছেন। অতএব আমাদের সকলকে সত্যধর্ম ও নির্বিকার মার্গ (পথ) অবলম্বন করে পরমাত্মার এই মহান কার্যে সহযোগী হওয়া উচিত।

# রাবণ এবং রাবণ রাজ্যের প্রকৃত পরিচয়

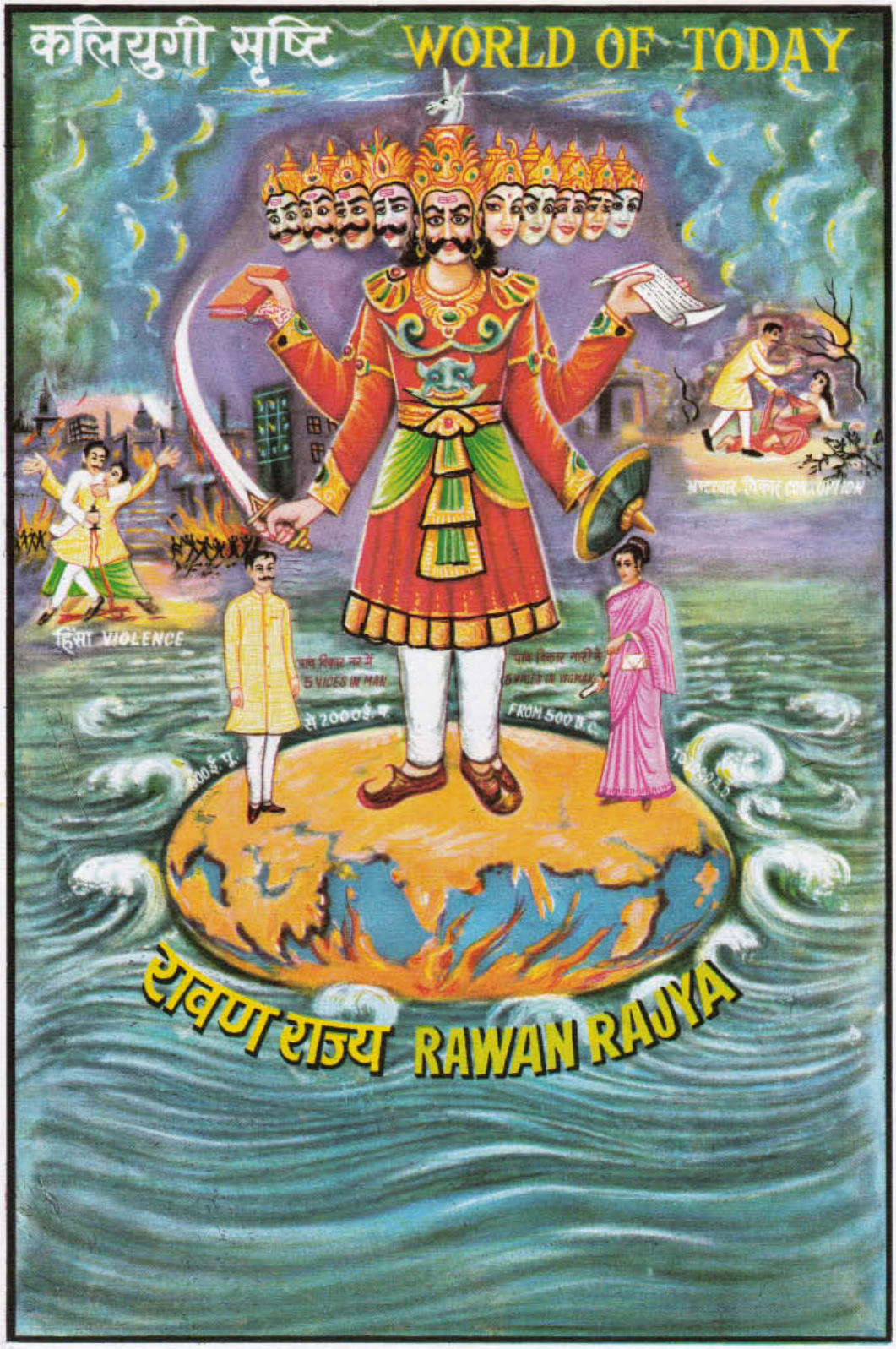

# মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য কী?

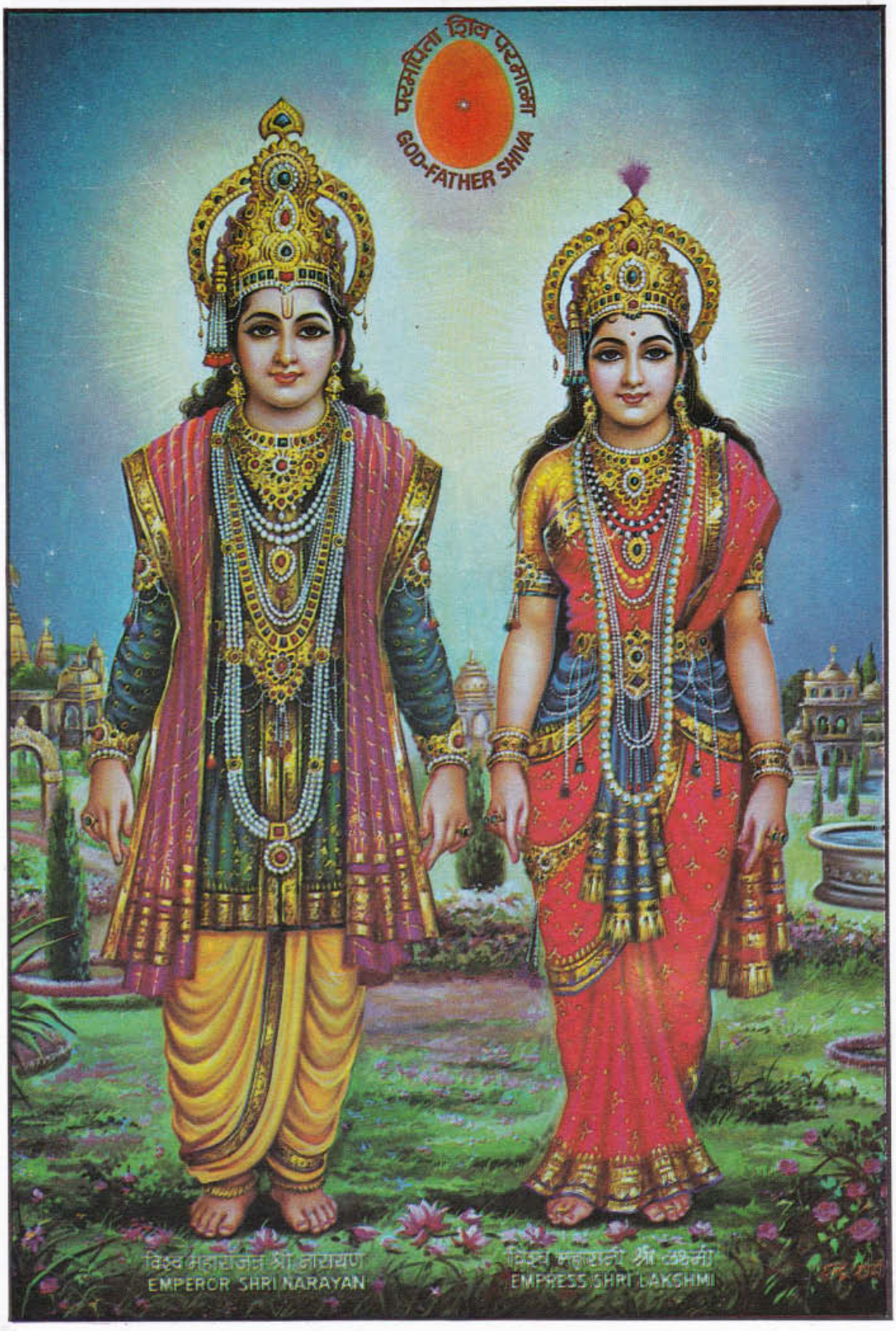

# মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য কী?

মানুষের বর্তমান জীবন অতি মূল্যবান। কারণ এই সঙ্গম যুগেই সে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করে জন্ম জন্মান্তরের জন্য সর্বোত্তম প্রারব্ধ তৈরি করতে পারে এবং অতুলনীয় হীরা-তুল্য জীবন লাভ করতে পারে। মানুষ এই জন্মেই সৃষ্টির মালিক অথবা বিশ্ব-বিজয়ী হবার পুরুষার্থ করতে পারে। পরন্তু আজ মানুষের জীবনের লক্ষ্য কী না জানার জন্য সে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করার পরিবর্তে এই জীবন বিষয়-বিকার তথা ভোগ-লালসার দ্বারা নষ্ট করছে অথবা অল্প কালের প্রাপ্তির জন্যই লেগে আছে। আজ মানুষ লৌকিক শিক্ষা দ্বারা উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হবার জন্য পুরুষার্থ করছে আবার কোন কোন ব্যক্তি রাজনীতির পথে দেশের নেতা, মন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য চেষ্টা করে। আবার অনেকে এসব ভোগ বাসনা থেকে সন্ন্যাস নিয়ে 'সন্ন্যাসী' হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু সকলেই জানে যে এই মৃত্যুলোকে, রাজা, রানি, নেতা, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সন্ন্যাসী প্রমুখ কেউই পূর্ণ সুখী নয়। সকলেরই শরীরের রোগ, মনের অশান্তি, অর্থের অভাব, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার চিন্তা অথবা প্রকৃতির মাধ্যমে পীড়া ইত্যাদি কোন না কোন দুঃখ ও অশান্তি লেগেই আছে। সুতরাং এসবের প্রাপ্তি দ্বারা মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যের প্রাপ্তি হয় না কেননা মানুষ, সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সদা সুখ ও স্থায়ী শান্তি চায়।

এখানে চিত্রে দেখান হয়েছে যে মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য মুক্তি অথবা বৈকুণ্ঠে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি সম্পন্ন শ্রীনারায়ণ অথবা শ্রীলক্ষ্মীর পদ প্রাপ্তি। বৈকুণ্ঠের দেবতাদের অমর মানা হয়, তাঁদের অকাল মৃত্যু হয় না, তাঁদের কাঞ্চন-কায়া, সদা নীরোগ দেহ হয় এবং তাঁদের সম্পদ কোন সময় ফুরোয় না। এজন্যই মানুষ স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠকে আজও স্মরণ করে তাই কোন প্রিয়জন দেহত্যাগ করলে বলে — "সে স্বর্গে চলে গেছে।"

## স্বয়ং পরমাত্মাই ঈশ্বরীয় জ্ঞান দ্বারা এই পদের প্রাপ্তি করান

এই লক্ষ্যের প্রাপ্তি কোন মানুষ অর্থাৎ কোন সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু অথবা জগদ্‌গুরু করাতে পারে না পরন্তু দ্বিমুকুট বিশিষ্ট দেবপদ অথবা রাজা-রানির পদ, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' থেকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে ঈশ্বরীয় জ্ঞান তথা সহজ রাজযোগের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

বর্তমানে বিশ্বকল্যাণে পরমপিতা পরমাত্মা শিব সর্বোত্তম ঈশ্বরীয় বিদ্যার শিক্ষা দান করার জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্থাপন করেছেন সুতরাং সকল নর-নারীর উচিত নিজেদের ঘর-সংসারে বাস করেও, নিজের কাজকর্ম জীবিকা অর্জন করার সাথে সাথে প্রতিদিন এক - দুঘন্টা সময় করে নিজের ভবিষ্যত জন্ম-জন্মান্তরের কল্যাণের জন্য এই সর্বোত্তম তথা সহজ বিদ্যার শিক্ষা লাভ করা।

এই বিদ্যা প্রাপ্তির জন্য কোন খরচের প্রয়োজন নেই। এজন্য নির্ধন ব্যক্তিও এই বিদ্যা লাভ করে নিজের ভাগ্য গড়তে পারে। এই বিদ্যা প্রাপ্তির অধিকার কন্যাদের, মাতাদের, বৃদ্ধদের, যুবকদের, ছোট শিশুদের, তরুণ, কিশোর প্রভৃতি সকলের আছে। কারণ আত্মিক দৃষ্টিতে সকলেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান।

## এখন নয় তো কখনই নয়

এই জন্ম সকলের শেষ জন্ম। এজন্য এখনই এই পুরুষার্থ না করলে আর কখনও করা সম্ভব হবে না। কারণ স্বয়ং জ্ঞান-সাগর পরমাত্মা দ্বারা প্রদত্ত এই মূল গীতা-জ্ঞান কল্পে কেবল একবারই এই কল্যাণকারী সঙ্গ ময়ুগেই পাওয়া যায়।

# নিকট ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন

আজকাল প্রতিদিন সংবাদ পত্রে আকাল, বন্যা, ভ্রষ্টাচার ও মারামারির খবর দেখা যায়। প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বও মানুষকে দুঃখ দিচ্ছে এবং সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া ও পরিবেশ মাত্রাধিক্য দূষিত হয়ে গেছে। অত্যাচার, বিষয় বিকার তথা অধর্মের প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে এবং এই পৃথিবী কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন এই বিশ্বে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির সাম্রাজ্য ছিল এবং সারা সৃষ্টিই ফুলের বাগিচা তথা 'নন্দন কানন' ছিল। প্রকৃতি সতোপ্রধান থাকায় কোন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিলই না। মানুষও সতোপ্রধান দৈবী গুণ-সম্পন্ন ছিল এবং আনন্দ ও সুখে জীবন যাপন করত। এই সময় সংসার স্বর্গ ছিল যাকে 'সত্যযুগ' বলা হয়। এই বিশ্বে সমৃদ্ধি, সুখ ও শান্তির প্রধান কারণ ছিল সেসময়ে 'যথা রাজা তথা প্রজা' সকলেই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। এজন্য তাদের সোনার মণিমুক্তা-খচিত মুকুট ছাড়াও পবিত্রতার মুকুট (প্রভা-মণ্ডল) দেখান হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার ও রাজকুমারী ছিলেন যাঁদের স্বয়ংবরের পর শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণ নাম হয়। তাঁদের রাজ্যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল পান করত অর্থাৎ পশু-পাখিরাও সম্পূর্ণ অহিংসক ছিল। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী, নির্বিকার, অহিংসক ও মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিল। সেজন্যই তাঁদের দেবতা বলা হয়। তাঁদের তুলনায় আজকের মানুষ বিকারী, দুঃখী এবং অশান্ত হয়ে গেছে। এই সংসার নরকে পরিণত হয়েছে। সকল নরনারীই কাম, ক্রোধাদি বিষয়-বিকারে ডুবে আছে। সকলের কাঁধের উপর মায়ার (বিকর্মের) বোঝা চেপে আছে, একজন মানুষও বিকার ও দুঃখ থেকে মুক্ত নয়।

অতএব এখন পরমপিতা, পরম শিক্ষক, পরম সদ্‌গুরু, পরমাত্মা 'শিব' বলছেন, "হে প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা আমাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছ — হে প্রভু, আমাদের দুঃখ ও অশান্তি থেকে মুক্ত কর, আমাদের মুক্তিধাম ও স্বর্গে নিয়ে চল। সেজন্য এখন আমি তোমাদের মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তথা এই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ পবিত্র বা স্বর্গে পরিণত করতে এসেছি। বৎস, বর্তমান জন্ম সবার শেষ জন্ম। এখন তোমরা বৈকুণ্ঠে (সত্যযুগী পবিত্র সৃষ্টিতে) যাবার জন্য প্রস্তুত হও অর্থাৎ পবিত্র ও যোগী হও। কেননা নিকট ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণ) রাজ্য আগতপ্রায়। এই কলিযুগী বিকারী সৃষ্টির মহাবিনাশ আণবিক বোমা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে হবে।" চিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'বিশ্বের গ্লোবের' উপর দেখান হয়েছে তার অর্থ হল সমগ্র বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণ) একচ্ছত্র রাজ্য হবে। এক ধর্ম, এক ভাষা, একমত হবে তথা সমৃদ্ধি, সুখ শান্তি ও সম্পদে ভরপুর খুশির জোয়ারে মধুর বাঁশরী বাজবে।

বহু মানুষের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের শেষে আসেন। কিন্তু তাদের এটা জানা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বগুণ-সম্পন্ন, ষোল কলা সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকার পবিত্র ছিলেন। তাহলে রজঃপ্রধান এবং বিকারযুক্ত দ্বাপরের সৃষ্টিতে তাঁর কীভাবে জন্ম হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ভক্ত সুরদাস অপবিত্র দৃষ্টি দূর করতে নিজের দুই চোখ অন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং কৃষ্ণ-ভক্ত মীরাবাঈ পবিত্র থাকার জন্য বিষের পেয়ালা পান করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে কী করে শ্রীকৃষ্ণ অপবিত্র দৃষ্টি বৃত্তি পূর্ণ সৃষ্টিতে জন্ম নিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবরের পর শ্রীনারায়ণ হন। সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণের পরিণত বয়সের চিত্র পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীনারায়ণই সত্যযুগ পবিত্র সৃষ্টির প্রারম্ভে এসেছিলেন এবং পুনরায় আসছেন।

অদূরেই শ্রীকৃষ্ণ আসছেন

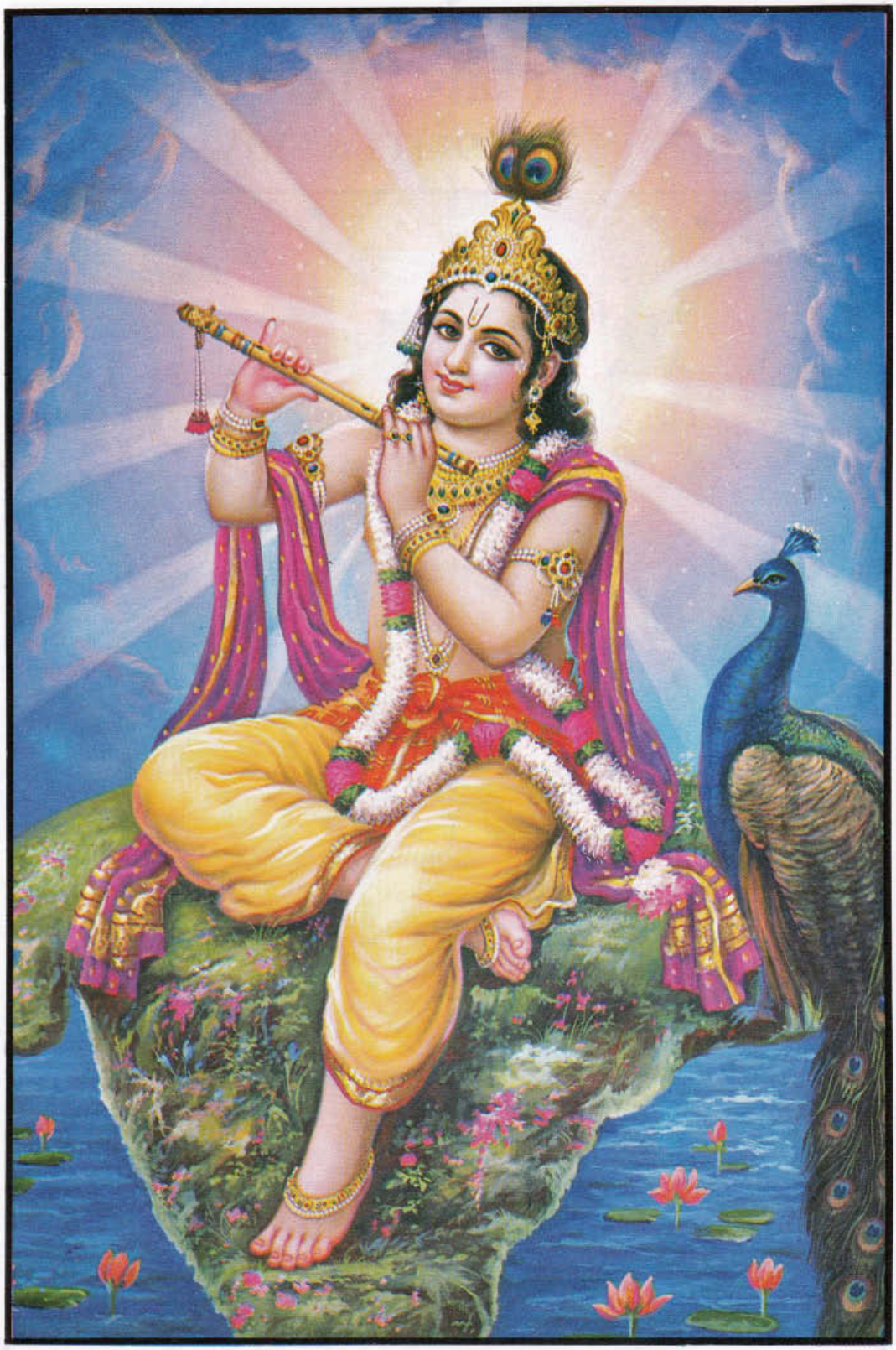

# গীতার জ্ঞান দাতা কে?

# श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा हैं
## SHRI KRISHNA IS A DEITY & SHIVA IS GOD

# সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার জ্ঞানদাতা কে?

আশ্চর্যের কথা যে আজ বহু মানুষেরই জানা নেই যে পরমপ্রিয় পরমাত্মা শিব, যাঁকে 'জ্ঞানসাগর' তথা 'কল্যাণময়' বিবেচনা করা হয়, মানুষের কল্যাণের জন্য যে জ্ঞান দিচ্ছেন তার শাস্ত্র কোনটি? দ্বাপর যুগের শেষে যুদ্ধের ময়দানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে সারথি হওয়ার অর্থ কী?

## গীতা জ্ঞান দ্বাপর যুগে দেওয়া হয়নি পরন্তু সঙ্গম যুগে দেওয়া হয়েছিল

চিত্রে এই আশ্চর্য রহস্য দেখান হয়েছে যে **বাস্তবে গীতা জ্ঞান নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব দিয়েছিলেন এবং গীতা-জ্ঞান দ্বারাই সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। অতএব গোপেশ্বর পরমপিতা শিব শ্রীকৃষ্ণের পারলৌকিক পিতা এবং গীতা শ্রীকৃষ্ণের মাতা।**

একথা সকলেই জানে যে গীতা জ্ঞান দেবার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে ধর্মের পুনঃস্থাপনা করা। গীতাতে ভগবান স্পষ্ট বলেছেন — "আমি অধর্মের বিনাশ তথা সত্যধর্ম স্থাপনের জন্য অবতরণ করি।" অতএব ভগবান অবতরিত হবার পর তথা গীতা জ্ঞান দেবার পর, ধর্ম তথা দৈবী স্বভাব সম্পন্ন সম্প্রদায়ের পুনঃস্থাপন হওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই জানে যে দ্বাপর যুগের পর কলিযুগের শুরু হয়েছিল। যেখানে ধর্মের আরও বেশি গ্লানি হয় এবং মানুষের স্বভাব আরও বেশি তমোপ্রধান ও আসুরী হয়ে ওঠে। সুতরাং যারা একথা মানে যে ভগবান গীতা-জ্ঞান দ্বাপর যুগের শেষে দিয়েছিলেন তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, গীতা জ্ঞান দেওয়া ও ভগবানের অবতরণের ফল কি এই পতন? গীতা জ্ঞান দেবার পর কি অধর্মের যুগ শুরু হয়েছিল? স্পষ্টতঃ একথা মনে হয় যে এর উত্তরে তাঁরা 'না' বলবেন।

ভগবানের অবতরণের পর কলিযুগের শুরু একথা মানা ও ভগবানের গ্লানি করা একই কথা। কারণ ভগবানের যথার্থ পরিচয় এই যে তিনি অবতরিত হয়ে পৃথিবীকে অসুরমুক্ত করেন এবং এখানে ধর্মের পূর্ণ-কলা স্থাপন করেন, নরকে শ্রীনারায়ণে পরিণত করে মানুষের সদ্‌গতি করেন। ভগবান সৃষ্টির 'বীজ-রূপ'। সুতরাং এই সৃষ্টিতে তাঁর আগমনে নতুন সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ অর্থাৎ সত্যযুগ আরম্ভ হয়। আজও দেখা যায় যে দীপাবলীর দিনে শ্রীলক্ষ্মীর আহ্বানের (পূজার) জন্য ভারতবাসী নিজেদের ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ও প্রদীপ, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে অপবিত্র ও অন্ধকার স্থানে দেবতা নিজের চরণও রাখতে চায় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের জন্ম দ্বাপরে হয়েছিল একথা মানা একটি বিশাল ভুল। তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) জন্ম সত্যযুগে হয়েছিল যখন সকল আত্মীয়-পরিজন ও প্রকৃতি তত্ত্বও সতোপ্রধান ও দিব্য ছিল। সকলের আত্মা-রূপী প্রদীপ (দীপক) প্রজ্জ্বলিত ছিল ও এই সৃষ্টিতে কোন ম্লেচ্ছতা বা ক্লেশ ছিল না।

অতএব উপরের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে - না শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে জন্ম নিয়েছিলেন, না গীতা-জ্ঞান দ্বাপর যুগের শেষে দেওয়া হয়েছিল। নিরাকার, পতিতপাবন পরমাত্মা শিব কলিযুগের শেষে ও সত্যযুগের আদি অর্থাৎ সঙ্গম ক্ষণে ধর্ম-গ্লানির সময়ে ব্রহ্মার শরীরে দিব্য জন্ম নিয়ে (প্রবেশ করে) গীতা জ্ঞান দ্বারা সত্যযুগ তথা শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের) স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজের পিতা-মাতা, শিক্ষক ছিল কিন্তু গীতা-জ্ঞান সর্ব আত্মার মাতা-পিতা 'শিব'ই দিয়েছিলেন।

# গীতা-জ্ঞান হিংসার যুদ্ধ করার জন্য দেওয়া হয়নি

পরমাত্মার দিব্য জন্ম আর 'রথ' এর স্বরূপ না জানার জন্য লোকের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস দানা বেঁধে আছে যে গীতা-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে সারথি হয়ে যুদ্ধের ময়দানে দিয়েছিলেন। সাধারণ বিচারধারাই এক বিশেষ প্রশ্নের সম্মুখীন করে যে, যখন অহিংসাকে পরম ধর্ম মানা হয় এবং ধর্মাত্মা ও মহাত্মা ব্যক্তিগণ অহিংসা পালন সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বিবেচনা করেন তথা অহিংস হওয়ার শিক্ষা দেন, তখন ভগবান কি কোন হিংসার যুদ্ধের জন্য কাউকে শিক্ষা দিয়েছিলেন? যখন লৌকিক পিতাও নিজের সন্তানদের পরস্পর লড়াই-ঝগড়া না করার শিক্ষা দেয় তখন কি সৃষ্টির পরমপিতা, শান্তির সাগর পরমাত্মা মানুষকে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন? এটা কখনই হতে পারে না। ভগবান দৈবী স্বভাবের সম্প্রদায় তথা সর্বোত্তম ধর্মের স্থাপনের জন্যই গীতা-জ্ঞান দান করেন এবং তার দ্বারা মানুষ রাগ-দ্বেষ, হিংসা ক্রোধ ইত্যাদির উপর বিজয় লাভ করে।

অতএব প্রকৃত সত্য এটাই যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব এই সৃষ্টিরূপী কর্মক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র অথবা কুরুক্ষেত্রে প্রজাপিতা ব্রহ্মার (অর্জুন) শরীররূপী রথে 'সারথি' হয়ে 'মায়া' অর্থাৎ বিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখক পরবর্তীকালে রূপক আকারে তা বর্ণনা করেছে। চিত্রকরেরা পরে 'শরীর'কে 'রথ' রূপে অঙ্কিত করে ব্রহ্মার 'আত্মাকে' সেই রথে একজন মানুষ (অর্জুন) রূপে চিত্রিত করেছে। অবশেষে প্রকৃত রহস্য প্রায় লুপ্ত অথবা গৌণ হয়ে গেছে এবং স্থূল অর্থে প্রচলিত হয়ে গেছে।

সঙ্গমযুগে ভগবান শিব যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহ-রূপী রথে অবতরিত হয়ে জ্ঞান দেন ও ধর্মের স্থাপনা করেন, তার পরেই কলিযুগী সৃষ্টির মহাবিনাশ হয়ে যায় এবং সত্যযুগের স্থাপনা হয়। অতএব এই সুর্ববৃহৎ পরিবর্তনের জন্য পরবর্তীকালে এর প্রকৃত রহস্য প্রায় লোপ হয়ে যায়। পুনরায় যখন দ্বাপর যুগে গীতা লেখা হয় তখন বহুপূর্বের (সঙ্গমযুগের) হওয়া ঘটনার বৃত্তান্ত সমূহের বিবরণ ব্যাসদেব বর্তমান কাল (Present Tense) প্রয়োগের মাধ্যমে করেছেন সেটাকে লোকে কালান্তরে 'গীতা-জ্ঞান'কেও ব্যাসবদেরে জীবনকালে অর্থাৎ 'দ্বাপর যুগে' দেওয়া জ্ঞান বলে মেনে নিয়েছে। এই ভুলের দ্বারা সংসারের (জগতে) ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে। কারণ লোকের যদি এই রহস্য ঠিকমত জানা থাকত যে গীতা-জ্ঞান নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' দিয়েছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণেরও পারলৌকিক পিতা এবং সকল ধর্ম অনুযায়ী পরমপূজ্য তথা সকলেরই একমাত্র সদ্‌গতি দাতা বা রাজ্য-ভাগ্য দেবার মালিক, তাহলে সর্ব-ধর্মের অনুগামীরা গীতাকেই সংসারের সর্বোত্তম শাস্ত্র বলে মান্য করত। গীতার মহাবাক্য পরমপিতার মহাবাক্যরূপে শিরোধার্য করে ভারতকেই নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মনে করত তথা 'শিব-জয়ন্তীকে' 'গীতা-জয়ন্তী' বা 'গীতা-জয়ন্তীকে' 'শিব-জয়ন্তী' রূপে মান্য করত। তাঁর কাছ থেকে সুখ-শান্তির পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করত।

কিন্তু আজ উপরোক্ত রহস্য না জানার জন্য এবং **গীতা-মাতার পতি সর্বমান্য নিরাকার পরমাত্মা শিবের পরিবর্তে গীতা-পুত্র দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দেবার জন্য গীতা ভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং জগতে ঘোর অনর্থ হাহাকার তথা পাপাচার ছেয়ে গেছে।** লোকে এক নিরাকার পরমপিতার আজ্ঞা ('মন্মনা ভব' অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর) ভুলে ব্যভিচারী বুদ্ধিযুক্ত হয়ে গেছে। আজ পুনরায় উপরোক্ত রহস্য জেনে পরমপিতা পরামাত্মার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হলে পুনরায় এই ভারতে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীনারায়ণের সুখদায়ী স্বরাজ্য স্থাপন হতে পারে এবং বাস্তবে তা হচ্ছেও।

# গীতার বর্ণিত যুদ্ধের আধ্যাত্মিক রহস্য!

# জীবন কমল পুষ্প সমান কি ভাবে হয়?

# জীবন কমল পুষ্প সমান কীভাবে হয়?

স্নেহ ও সৌহার্দ্যের অভাবের জন্য আজ মানুষের নিজের ঘরকে ঘর অনুভব করে না। সামান্য একটু কারণে বাড়ীর পুরো পরিবেশ খারাপ হয়ে যায়। এখন মানুষের মধ্যে সত্যতা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। নৈতিক মূল্যবোধ নিজের সুউচ্চ স্থান থেকে যথেষ্ট নীচে নেমে গেছে। অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট যেখানেই হোক সর্বত্র পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিজেকে আচার-ব্যবহারে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং মিলেমিশে চলার প্রয়োজন হয়। নিজের অবস্থা নির্দোষ ও তার ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য প্রতি ব্যক্তিকে তার মনোবল জমা করার প্রয়োজন। এজন্য যোগ (ঈশ্বর স্মরণ) প্রভূত সহায়ক হতে পারে।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মাকুমার সে অন্যকেও শান্তির পথ দেখায়। সেবা ধর্মকে নিজের কর্তব্য মনে করে। ব্রহ্মাকুমার জনে-জনে এই সন্দেশ দান করছে যে 'শান্তি' পবিত্র জীবনের অনিবার্য ফল। পবিত্রতা ও শান্তির জন্য পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় তথা তাঁর সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজন। অতএব সে (ব্রহ্মাকুমার) অপরকে রাজযোগ কেন্দ্রে অথবা ঈশ্বরীয় মনন-চিন্তন কেন্দ্রে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে তাকে রাজযোগের অভ্যাস কীভাবে করতে হয় এবং জীবন কমল-পুষ্প সমান কীভাবে করা যায় এই কলা শেখানো হয়। এই জ্ঞান ও যোগ শেখার ফল যে কোন স্থানে কর্মরত অবস্থায়ও মানুষ শান্তির সাগর পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। এসব করার শ্রেষ্ঠ পরিণাম সারা সংসার স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ও শান্তির সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় — তারা সকলেই সেই পরিবেশে আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করে। সেই পরিবার সুখী, সুব্যবস্থিত এবং সুগঠিত পরিবার হয়ে যায়।

**দিব্য জ্ঞান দ্বারা মানুষ বিকার ত্যাগ করে এবং গুণ ধারণ করে নেয়। এজন্য, যে মনোবলের প্রয়োজন সেই মনোবল মানুষ যোগ দ্বারা প্রাপ্ত করে। এইরূপে মানুষ নিজের জীবন কমল-পুষ্পের সমান পরিবর্তন করার যোগ্য হয়ে যায়।**

কমল-পুষ্পের এই বিশেষত্ব যে জলে জন্মেও সেটি জল থেকে স্বতন্ত্র থাকে। যদিও কমলের শিকড়, ডাঁটা প্রভৃতি জলে আছে তবুও প্রস্ফুটিত কমল সকলের উপরে থাকে। ঠিক সেরূপ আমাদেরও আত্মীয়-পরিজন ও মিত্রদের মাঝে থেকেও তাদের প্রতি নিরাসক্ত অর্থাৎ মোহজিৎ হয়ে থাকা উচিত।

অনেকে বলে যে ঘর গৃহস্থে বাস করে এরকম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে হাসপাতালে নার্স (Nurse) অনেক বাচ্চাদের দেখাশুনা করা সত্ত্বেও তাদের থেকে মোহ-রহিত হয়ে থাকে। এই প্রকারে আমাদেরও উচিত সকলকে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান মনে করে Trustee অর্থাৎ সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে তাদের সঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার করা। একজন বিচারক (Judge) খুশি অথবা বিষাদের রায় দান করে কিন্তু সে কখনও নিজে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। এভাবে আমরাও যাতে সুখ-দুঃখের সর্ব অবস্থা বা পরিস্থিতিতে সাক্ষী হয়ে থাকি, সেজন্য আমাদেরও সহজ রাজযোগ শিক্ষা প্রয়োজন।

# রাজযোগের আধার তথা বিধি

মানুষের সম্পূর্ণ স্থিতি প্রাপ্ত করার জন্য এবং সত্বর আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য রাজযোগের নিরন্তর অভ্যাস প্রয়োজন। অর্থাৎ চলতে ফিরতে কাজ কর্ম করতে করতেও পরমাত্মার স্মৃতিতে স্থিত থাকা প্রয়োজন।

যদিও নিরন্তর যোগে প্রভূত লাভ এবং নিরন্তর যোগ দ্বারাই মানুষ সর্বোত্তম অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারে তবুও বিশেষরূপে যোগে বসা প্রয়োজন। এজন্য চিত্রে দেখান হয়েছে যে পরমাত্মাকে স্মরণ করার সময়ে আমাদের বুদ্ধি, মন অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত করে এক জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মা শিবের সঙ্গে জুড়তে হবে। মন চঞ্চল হবার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার অথবা শাস্ত্র এবং গুরু ইত্যাদির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা আমাদের মন এক পরমাত্মার স্মৃতিতে স্থির করতে হবে। অতএব দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে আত্মা স্বরূপে স্থিত হয়ে বুদ্ধি জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মা শিবের স্নেহযুক্ত স্মৃতিতে স্থির রাখাই প্রকৃত যোগ, যেমনটি চিত্রে দেখান হয়েছে।

অনেকে যোগকে খুব কঠিন বলে মনে করে। তারা নানা প্রকার হঠক্রিয়া, জপ্-তপ্ অথবা প্রাণায়াম করতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে 'যোগ' অতি সহজ। যেমন সন্তানের নিজের পিতাকে অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে মনে থাকে তেমনিই 'আত্মার নিজের পিতা' 'পরমাত্মা'র স্মৃতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আসা উচিত। এই অভ্যাসের জন্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন — 'আমি এক আত্মা, জ্যোতির্বিন্দু-স্বরূপ এবং জ্যোতি-বিন্দু পরমাত্মা 'শিবের' অবিনাশী সন্তান, যে পিতা ব্রহ্মলোক নিবাসী শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, প্রেমের সাগর এবং সর্বশক্তিমান।'' এরূপ মনন করতে করতে মনকে ব্রহ্মলোকে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে এবং পরমাত্মার দিব্য গুণাবলী ও কর্তব্য মনন করতে হবে।

যখন মন এইরূপ স্মৃতিতে স্থিত হবে তখন সাংসারিক সম্বন্ধ অথবা বস্তুর আকর্ষণ অনুভব হবে না। যতই পরমাত্মার জ্ঞানে নিশ্চয় হবে; ততই সাংসারিক ভাবনা চিন্তা এবং লৌকিক পরিজনদের স্মৃতি মন থেকে দূর হবে এবং নিজের স্বরূপ ও পরমপ্রিয় পরমাত্মার গুণাবলীর অনুভব হবে।

আজ অনেকে বলে যে আমার মন পরমাত্মার স্মৃতিতে স্থির থাকে না অথবা আমার যোগ লাগে না। এর অন্যতম কারণ সে আত্মা অনুভব করেনি। সকলেই জানে যে যখন বিদ্যুতের দুটো তার জুড়তে হয় তখন তার উপর থেকে রবারের আবরণ কেটে ফেলতে হয় তাহলেই বিদ্যুতের প্রবাহ (current) আসে। ঠিক সেইপ্রকার, যদি কেউ নিজে 'দেহজ্ঞানে' থাকে অথবা কোন দেহধারী মানুষ বা দেবতার স্মৃতিতে থাকে তাহলে তারও অব্যক্ত অনুভূতি হবে না, তার মনের ভাব পরমাত্মার সঙ্গে জুড়তে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে নাম-রূপ বিহীন সর্বব্যাপী মনে করে, সে মনকে কোন বিশেষ ঠিকানায় বা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পরমাত্মার দিব্য নাম 'শিব', দিব্য-রূপ জ্যোতি-বিন্দু, আর দিব্য ধাম পরমধাম অথবা ব্রহ্মলোক। অতএব সেখানে মনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ লোকের পরমাত্মার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধেরও পরিচয় নেই। এজন্য পরমাত্মার প্রতি তার মনে নৈকট্য তথা ঘনিষ্ঠ ভালবাসা নেই; এখন এই জ্ঞান হবার পর আমাদের ব্রহ্মলোকবাসী পরমপ্রিয় পরমাত্মা 'শিব' — জ্যোতি-বিন্দুর স্মৃতিতে স্থিত থাকা উচিত।

# রাজযোগের আধার ও বিধি কি কি?

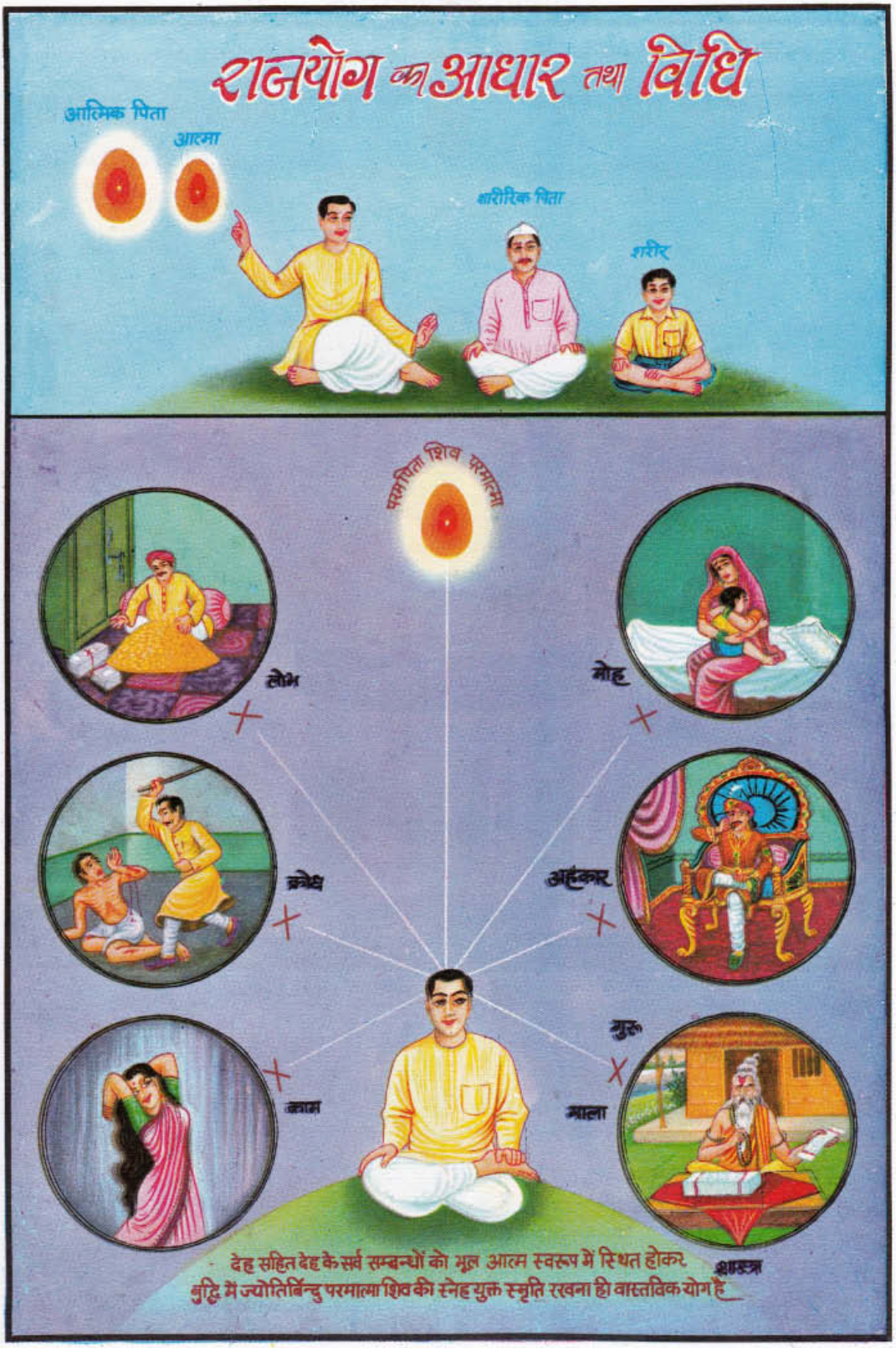

# রাজযোগের স্তম্ভ তথা নিয়ম

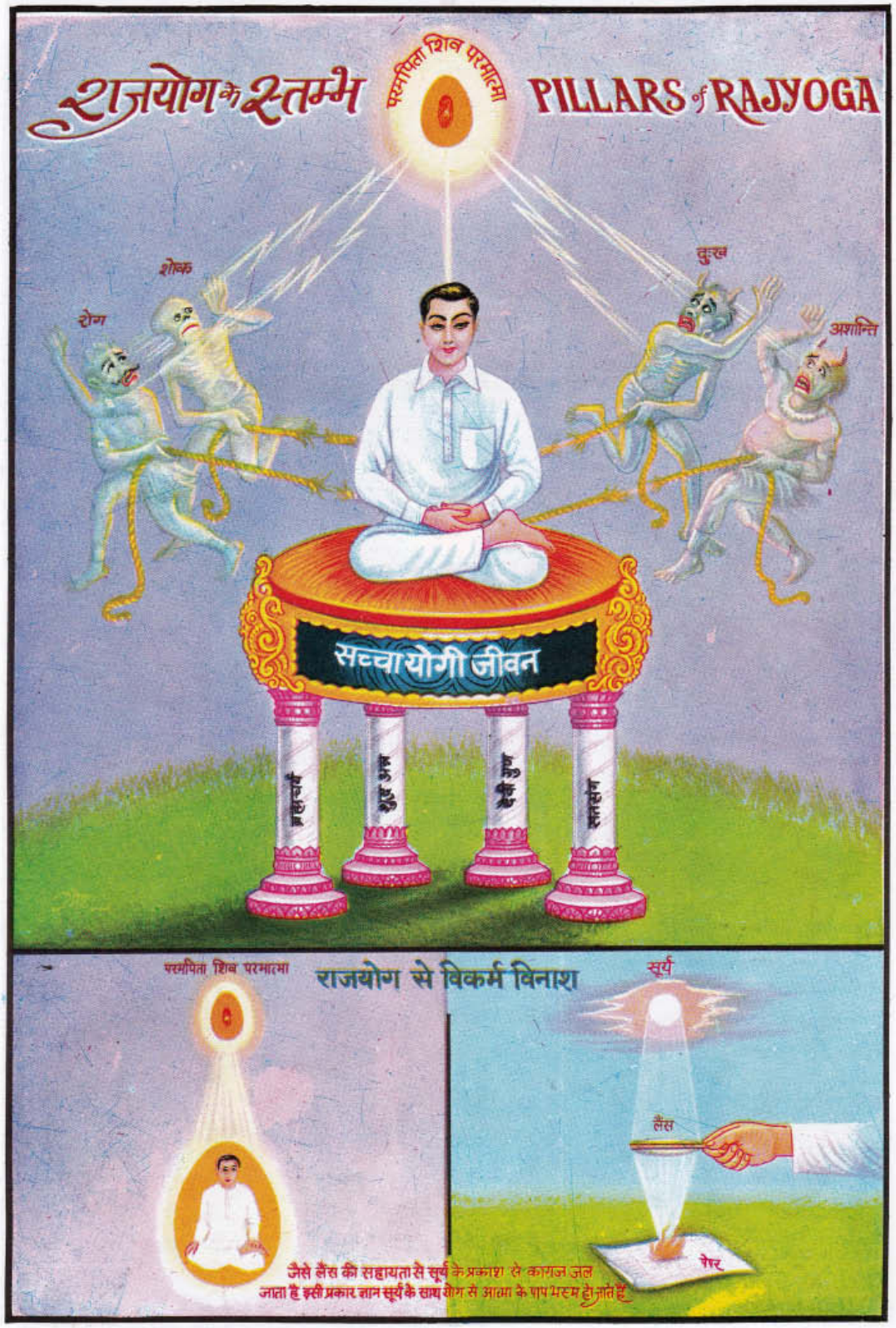

# রাজযোগের স্তম্ভ তথা নিয়ম

বাস্তবে 'যোগ' শব্দের অর্থ - জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, প্রেমের সাগর, সর্বশক্তিমান পতিত-পাবন পরমাত্মা শিবের সঙ্গে আত্মার 'সম্বন্ধ' স্থাপন ফলস্বরূপ আত্মার শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, শক্তি ও দিব্যগুণের উত্তরাধিকার লাভ।

যোগ অভ্যাসের জন্য আচরণ সম্বন্ধে কিছু নিয়ম বা দিব্য অনুশাসন পালন করা প্রয়োজন। কারণ যোগের উদ্দেশ্যই হল মনকে শুদ্ধ করা, দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা এবং মনকে সদা প্রসন্ন ও প্রফুল্ল রাখা। যোগের উচ্চস্থিতি কোন স্তম্ভের (Pillar) উপর দাঁড়িয়ে থাকে?

যোগের প্রথম স্তম্ভ-**'ব্রহ্মচর্য'** অথবা **'পবিত্রতা'**। যোগী শারীরিক সৌন্দর্য বা বাসনা-ভোগের প্রতি আকর্ষিত হয় না, কেননা তার দৃষ্টি-কোণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে আত্মার সৌন্দর্যকেই পূর্ণ মহত্ত্ব বা মর্যাদা দেয়। তার জীবনে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রতিভাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার মন ব্রহ্মে স্থিত হয় এবং সে দেহ অপেক্ষা বিদেহী (আত্মাভিমানী) অবস্থায় থাকে। সুতরাং সে সকলকে ভাই-ভাই রূপে দেখে এবং আত্মিক প্রেম বা সম্বন্ধেরই আনন্দ গ্রহণ করে। আত্মিক স্মৃতি আর ব্রহ্মচর্য শারীরিক শক্তি, কার্য-ক্ষমতা, নৈতিক বল এবং আত্মিক শক্তি দান করে, মনোবল বৃদ্ধি করে এবং তাকে নির্ণয় শক্তি, মানসিক ভারসাম্য ও কুশলতা দান করে।

যোগের দ্বিতীয় মহত্ত্বপূর্ণ স্তম্ভ — **'সাত্ত্বিক আহার'**। মানুষ যা আহার করে তার মস্তিষ্কের (Brain) উপর তাদের গভীর প্রভাব পড়ে। এজন্য যোগীর মাছ, মাংস, ডিম, উত্তেজক পানীয় অথবা তামাক ইত্যাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। নিজের জীবন ধারণের জন্য তারা অন্য প্রাণী হত্যা করে না এবং তারা অনুচিত উপায়ে অর্থোপার্জনও করে না। তারা প্রথমে আহার ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করে। ভগবান দ্বারা স্বীকৃত সেই ভোজন তাদের মনে শান্তি ও পবিত্রতা দান করে। সেজন্যই 'যেমন অন্ন, তেমন মন' এই প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তাদের মন শুদ্ধ হয় এবং তাদের কামনা কল্যাণকারী তথা ভাবনা শুভ হয়ে থাকে।

যোগের তৃতীয় মহত্ত্বপূর্ণ স্তম্ভ — **'সৎসঙ্গ'**। 'যেমন সঙ্গ তেমন রং' এই প্রবাদ অনুসারে যোগী একথা সদা মনে রাখে যে তাকে সদা 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' স্বরূপ পরমাত্মার সহিত সঙ্গ রাখতে হবে। সে কখনও 'কুসঙ্গে ' অথবা অশ্লীল সাহিত্য অথবা চিন্তায় সময় ব্যর্থ নষ্ট করে না। সে একই প্রভুর স্মৃতিতে বা লগনে মগ্ন হয়ে থাকে। অজ্ঞানী, মিথ্যা-অভিমানী অথবা বিকারী দেহধারী মানুষকে স্মরণ করে না এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কও জোড়ে না।

যোগের চতুথ স্তম্ভ — **'দিব্যগুণ'**। যোগী সদা অন্য আত্মাদের নিজের দিব্য-গুণ, দিব্য-বিচার, তথা দিব্য-কর্ম দ্বারা সুগন্ধিত করে রাখে। কখনও আসুরী স্বভাব, বিচার বা আসুরী কর্মের বশীভূত হয় না। নম্রতা, সন্তুষ্টতা, হর্ষিতমুখতা, গম্ভীরতা, অন্তর্মুখতা, সহনশীলতা ও অন্যান্য দিব্য গুণ যোগের মুখ্য আধার। যোগী নিজে এসব গুণ ধারণ করার সাথে সাথে অন্য দুঃখী, ভুল ও বিপথগামী আত্মাদেরও নিজের গুণ দান করে এবং তাদের জীবনে প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রদান করে।

এই সকল নিয়মাবলী পালন করলেই মানুষ প্রকৃত যোগী জীবন গড়তে পারে তথা রোগ, শোক, দুঃখ বা অশান্তি রূপী ভূতদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে।

# রাজযোগের দ্বারা প্রাপ্তি — অষ্টশক্তি

রাজযোগের অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ মনের 'তার' পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করলে অবিনাশী সুখ-শান্তি প্রাপ্তি হয় সাথে সাথে কয়েক প্রকার আধ্যাত্মিক শক্তিও এসে যায়। এদের মধ্যে আটটি শক্তিই প্রধান ও খুবই মহত্ত্বপূর্ণ।

এর মধ্যে প্রথম **'বিস্তার করা ও বিস্তারকে সংকীর্ণ করার শক্তি'**। যেমন কচ্ছপ প্রয়োজনে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিতে পারে ও যখন খুশি সেগুলো ছড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি রাজযোগীও নিজের ইচ্ছানুসারে নিজের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে এবং যখন খুশি বিদেহী ও শান্ত অবস্থায় স্থিত থাকতে পারে। এইরূপ বিদেহী অবস্থায় থাকলে তার উপর মায়ার (বিকারের) বিঘ্ন থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় শক্তি — **'গুটিয়ে ফেলার শক্তি'**। সবাই এই সংসারকে পান্থশালা (মুসাফির খানা) বলে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তারা এতই বিস্তার করে নেয় যে নিজের কর্ম ও বুদ্ধিকে গুটিয়ে ফেলতে চেয়েও পারে না। কিন্তু যোগী তার বুদ্ধিকে এই বিশাল বিশ্বে ছড়িয়ে না দিয়ে এক পরমপিতা পরমাত্মার তথা আত্মিক সম্বন্ধের স্মৃতিতেই নিজের বুদ্ধি লাগিয়ে রাখে। সে কলিযুগী সংসার থেকে নিজের বুদ্ধি ও সংকল্পের জাল গুটিয়ে সদা নিজের ঘর পরমধামে - যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

তৃতীয় শক্তি হল — **'সহন শক্তি'**। যেমন বৃক্ষকে পাথর ছুঁড়ে মারলেও সে সুমিষ্ট ফল দেওয়া থেকে বিরত হয় না এবং অপকারীর প্রতিও উপকার করে, তেমনি যোগীও সদা অপকারীর প্রতি শুভ ভাবনা ও শুভ কামনাই রাখে।

যোগ দ্বারা চতুর্থ শক্তি — **'অন্তর্লীন করার শক্তি'**। যোগ অভ্যাসের দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিশালতা লাভ করে এবং সে গম্ভীরতা ও মর্যাদা লাভ করে। সামান্য খুশি, মান ও পদলাভ করে সে অহংকারী হয় না। সে কোন প্রকার ক্ষতি বা হানি হলেও দুঃখী হয় না। সে সমুদ্রের মত গভীর সদা নিজের দৈবী কুলের মর্যাদার মধ্যে থাকে। গম্ভীর অবস্থা থেকে অন্য আত্মাদের অবগুণ না দেখে কেবল তাদের থেকে গুণ গ্রহণ করে।

যোগ দ্বারা অপর যে শক্তি প্রাপ্তি হয় তা হল **'পরখ-শক্তি'**। যেমন একজন জহুরী কোন গহনা কষ্ঠি পাথরে পরখ করে আসল-নকল জানতে পারে, তেমনি যোগীও যে কোন মনুষ্যাত্মার সম্পর্কে আসুক না কেন তাকে পরখ করে নিতে পারে এবং তার কাছে সত্য ও মিথ্যা কখনও লুকিয়ে রাখা যায় না। সে সদা সত্য জ্ঞান-রত্ন ধারণ করতে থাকে কিন্তু মিথ্যা কাঁকড়-পাথরে (অজ্ঞানতায়) নিজের বুদ্ধিকে মলিন করে না।

যোগী স্বতঃই **'নির্ণয় শক্তি'** লাভ করে। সে উচিত ও অনুচিত বিষয় সত্বর নির্ণয় করে ব্যর্থ সঙ্কল্প ও পরচিন্তন থেকে মুক্ত হয়ে সদা প্রভু-চিন্তায় মগ্ন থাকে।

যোগের দ্বারা যে কোন **'সমস্যার সম্মুখীন হবার শক্তি'** লাভ হয়। যদি তার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুও ঘটে অথবা সাংসারিক সমস্যার প্রচন্ড ঢেউও যদি আসে তাহলেও যোগী বিচলিত হয় না। তার আত্মারূপী প্রদীপ সদা জ্বলতে থাকে তথা অন্য আত্মাদেরও জ্ঞানের আলো দান করে।

অন্য যে শক্তি যোগের দ্বারা পাওয়া যায় তা হল **'সহযোগ শক্তি'**। যোগী নিজের তন, মন, ধন-এর দ্বারা ঈশ্বরীয় সেবা করে উপরন্তু তার দ্বারা অন্য আত্মাদের সহযোগ স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। কলিযুগী পাহাড় (বিকারী সংসার) ওঠাতে নিজের পবিত্র জীবনরূপী আঙ্গুল দিয়ে স্বর্গ স্থাপনার পর্বত-প্রমাণ কার্যে সে সহযোগী হয়।

# রাজযোগের দ্বারা প্রাপ্তি — অষ্টশক্তি

# ঈশ্বরীয় স্মৃতির দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি

# রাজযোগের যাত্রা - স্বর্গযাত্রা

রাজযোগের নিরন্তর অভ্যাসে মানুষ অনেক প্রকার শক্তি লাভ করতে পারে। এই সকল শক্তি দ্বারাই মানুষ সাংসারিক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে পারে। আজ মানুষ নানা প্রকার রোগ, শোক, চিন্তা ও দুর্ভাবনায় ডুবে আছে। এই সৃষ্টি ঘোর নরকে পরিণত হয়েছে। এই নারকীয় পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিটি মানুষ সুখ-শান্তিময় স্বর্গীয় জীবনের দিকে যেতে চায় — কিন্তু এই নরক থেকে স্বর্গীয় জীবনের যাত্রাপথ বহু বাধা বিঘ্নের কন্টকে আকীর্ণ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার এই পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে জ্ঞান-সাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন তা ধারণ করলেই মানুষ উপরোক্ত পাঁচ বিকাররূপী শত্রুদের জয় করতে পারে।

চিত্রে দেখান হয়েছে যে, নরক থেকে স্বর্গে যাবার জন্য মানুষকে প্রথমে **'কাম'** বিকারের উঁচু প্রাচীর পার হতে হয় যাতে শত শত লোহার কাঁটা দেওয়া আছে। এই বাঁধা পার হবার জন্য দেহ অভিমানের কারণে কোন কোন ব্যক্তি সফল হতে পারে না, কাঁটা রূপী বিকারে আটকে পড়ে। বিকারী দৃষ্টি, বৃত্তি ও কর্ম প্রাচীর পার হতে দেয় না। অতএব পবিত্র দৃষ্টি (Civil eye) দ্বারা এই বিকারকে জয় করা অতি প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ভয়ংকর বিঘ্ন **'ক্রোধরূপী অগ্নি'**। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ সত্য - অসত্যের ভেদ বিস্মৃত হয়। পরন্তু ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি বিকারের সমাবেশ ঘটে যার আগুনে সে নিজেও জ্বলে আর সাথে সাথে অপরকেও জ্বালায়। এই বাধা পার হতে হলে নিজের 'স্বধর্ম' অর্থাৎ 'আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ' এই সত্য উপলব্ধি হওয়া অতি প্রয়োজন।

**'লোভ'** ও মানুষকে তার সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য পথ অবরোধ করে বসে থাকে। লোভী ব্যক্তি কখনও শান্তিতে থাকতে পারে না। সে মনকে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের স্মৃতিতে স্থিত রাখতে পারে না। অতএব স্বর্গীয় সুখ-শান্তিময় জীবন লাভের জন্য ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির লোভের আকর্ষণের ওপর জয়লাভ করতে হবে।

**'মোহ'** ও এক প্রকারের বাঁধা যা মাকড়সার জালের মত। মানুষ মোহ-বন্ধনের বশে নিজের ধর্ম ও কর্মকেও ভুলে যায়। তাই গীতাতে ভগবান বলেন — 'নষ্ট মোহা স্মৃতির্লব্ধাঃ হও, অর্থাৎ দেহসহ দেহের সকল সম্বন্ধের মোহজাল থেকে মনকে মুক্ত করে পরমাত্মার স্মৃতিতে স্থিত হয়ে যাও। নিজের কর্তব্য করে চলো, তাতেই স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। সেহেতু মনুষ্যাত্মার মোহের বন্ধন-জাল থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

**'অহংকার'**ও মানুষের উন্নতির পথে পর্বতের মত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অহংকারী ব্যক্তি কখনও পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না। অহংকার বশে মানুষ পাহাড়ের চূড়ার মত উঁচু স্থান থেকে নীচে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং স্বর্গীয় জীবন লাভের জন্য অহংকারকে জয় করা অতি আবশ্যক।

অতএব, স্পষ্টই বোঝা যায় — বিকারের ওপর বিজয় লাভ করলেই মানুষ দৈবগুণ ধারণ করে দেবতা হয়ে সত্যযুগ বা স্বর্গে যায়। মানুষ মৃত্যুর পর 'সে স্বর্গবাসী হয়েছে' বলে যে কথা বলে তা সম্পূর্ণ ভুল, মৃত্যু হলেই সকলে স্বর্গে যায় না। তাই যদি হত তাহলে এখানে (পৃথিবীতে) জন সংখ্যা কম হওয়া উচিৎ ও স্বর্গে ভিড় লেগে যাওয়া উচিৎ। মৃতের আত্মীয়স্বজনদের কারও মৃত্যুতে বিলাপ করা উচিৎ নয়।

# প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক মুখ্যালয় ঃ পাণ্ডব ভবন, মাউন্ট আবু - ৩০৭ ৫০১ (রাজস্থান)

## পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের রাজযোগ শিক্ষাকেন্দ্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যালয় | ঃ | ১এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০, ফোন ঃ ২৪৭৫-৩৫২১, ২৪৭৪-৫২৫১ |
| ২) | কলকাতা ৭০০ ০০৬ | ঃ | ২৩/৪সি, রায় বাগান স্ট্রীট, ফোন ঃ ২৫৫৫-৭০৭৩/২৫৯১ |
| ৩) | কলকাতা ৭০০ ০৫৫ | ঃ | ৮১/১, ব্লক সি, বাঙ্গুর এভিনিউ, ফোন ঃ ২৫৭৪-৭৮৬৩/০৯৫৫ |
| ৪) | কলকাতা ৭০০ ০৩৪ | ঃ | ৭৮, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, বেহালা, ফোন ঃ ২৩৯৭-৬৬৮৫ |
| ৫) | কলকাতা ৭০০ ০৫৪ | ঃ | "জ্ঞান সরোবর ধাম", ২-বি, মোতিলাল বসাক লেন, ফুলবাগান, ফোন ঃ ২৩৫৯-২৫৯১ |
| ৬) | কলকাতা ৭০০ ০৪৫ | ঃ | ১৬২ডি/৫৭৯, লেক গার্ডেন্স, স্টেট ব্যাঙ্কের নিকটে, ফোন ঃ ৯৪৩৩২ ৯৫৯৬৭ |
| ৭) | কলকাতা ৭০০ ০৩৬ | ঃ | ১৭, জি. এল. টি. রোড়, বরানগর বাজার, জ্যোতি গারমেন্টসের উপরে , ফোন ঃ ৯১৪৩৬০৫৯৯২ |
| ৮) | কলকাতা ৭০০ ০৫৪ | ঃ | পি-৫৬, সি.আই.টি. হাউজিং স্কীম - ১২, (৭-এম), নাস্তাগলি, কাঁকুরগাছি, ফোন ঃ ২৩৫৫-৮৬৮৩ |
| ৯) | কলকাতা ৭০০ ১০৫ | ঃ | ৯৬ডি, দক্ষিণী কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, মেট্রোপলিটন |
| ১০) | হাওড়া ৭১১ ১০২ | ঃ | বি১, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন্স, ১০৬, কে.সি. সিন্‌হা রোড, শিবপুর, ফোন ঃ ২৬৩৮-৬৫৯৪ |
| ১১) | কোন্নগর ৭১২ ২৩৫ | ঃ | ১১০/সি এবং ডি, এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৭৪-১২১১ |
| ১২) | হিন্দমোটর ৭১২ ২৩৩ | ঃ | ৩৭, সুকান্ত সরণী, মারওয়াড়ী পট্টী, ভদ্রকালী, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৯৪-১২৮৭ |
| ১৩) | চুঁচুড়া ৭১২১০২ | ঃ | ১১২, প্রিয়নগর (দঃ), পোষ্ট - চুঁচুড়া, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৮৬-৫৪৫৬ |
| ১৪) | শ্যামনগর ৭৪৩ ১২৭ | ঃ | ১০২, ভরত চন্দ্র রায় পথ, ২৪ পরগণা (উঃ), ফোন ঃ ২৫৮৬-২৮২২ |
| ১৫) | মালদা ৭৩২ ১০১ | ঃ | ১০০/২৭৩ ডি., উত্তর বালুচর, জুবিলী রোড, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২৩০৫৮ |
| ১৬) | কৃষ্ণনগর ৭৪১ ১০১ | ঃ | ৩৮/১, সুকান্ত সরণী, কাঁঠালপোতা, নদীয়া, ফোন ঃ ৯৩৩২৫৮১৪৮১ |
| ১৭) | বহরমপুর ৭৪২১০১ | ঃ | ৩৪/২, এস. এন. বাগচি রোড, চুঁয়াপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন ঃ ০৩৪৮২-২২৪৬৯১ |
| ১৮) | মেদিনীপুর ৭২১ ১০১ | ঃ | ডি-৩, অরবিন্দ নগর, জজ কোর্ট রোড, ফোন ঃ ০৩২২২-২৬৬৬৮৪ |
| ১৯) | তমলুক ৭২১ ৬৩৬ | ঃ | পার্বতীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন ঃ ০৩২২৮-২৬৭১০৬ |
| ২০) | কাঁথি ৭২১ ৪০১ | ঃ | সরস্বতীতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন ঃ ০৩২২০-২৫৮৯০৯ |
| ২১) | হলদিয়া ৭২১ ৬০৪ | ঃ | চৈতন্যপুর, খেজুরতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন ঃ ০৩২২৪-২৮৬৮৮২/২৭৩২৬৫ |
| ২২) | দুর্গাপুর ৭১৩ ২০৪ | ঃ | কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বেনাচিতি রোড, এ জোন, ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৭৪৮২৮ |
| ২৩) | রানীগঞ্জ ৭১৩ ৩৪৭ | ঃ | "শিবস্মৃতি ভবন", ড. বি. বি. রোড, স্কুল পাড়া, জেলা - বর্ধমান, ফোন ঃ ০৩৪১-২৪৪৯৮৪৮ |
| ২৪) | আসানসোল ৭১৩ ৩০১ | ঃ | ২৪০, এস.বি. গড়াই রোড, দুর্গা মন্দিরের কাছে, ফোন ঃ ০৩৪১-২২১৫৭৬১ |
| ২৫) | বোলপুর ৭৩১ ২০৪ | ঃ | তৃশূলাপট্টি (বাস স্টপেজের নিকটে), শান্তিনিকেতন, ফোন ঃ ০৩৪৬৩-২৫৪৫৭৭ |
| ২৬) | বাঁকুড়া ৭২২ ১০১ | ঃ | "রাজযোগ ভবন", কেরানীবাঁধ, নবপল্লী (রাঠীকল), ফোন ঃ ০৩২৪২-২৫৯৭৫৫ |
| ২৭) | চিরকুন্ডা ৮২৮ ২০২ | ঃ | নেহরু রোড, তালডাঙ্গা, জিলা - ধানবাদ, ফোন ঃ ০৬৫৪০-২৭২০৬৪ |
| ২৮) | বর্ধমান ৭১৩ ১০১ | ঃ | সাধনপুর রোড, বর্ধমান ভবনের কাছে , ফোন ঃ ০৩৪২-২৬২৫২৭৭ |
| ২৯) | বনগাঁও ৭৪৩ ২৩৫ | ঃ | আমলাপাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ) ফোন ঃ ০৩২১৫-২৫৭৫২১ |
| ৩০) | শিলিগুড়ি ৭৩৪ ০০১ | ঃ | "দিব্যধাম", হিমাচল সরণী, হায়দারপাড়া রোড, ফোন ঃ ০৩৫৩-২৬৪২১৮৬ |
| ৩১) | দার্জিলিং ৭৩৪ ১০১ | ঃ | ২০/১, মহাতাব চাঁদ রোড, কুয়ীন্‌স হিল, ফোন ঃ ০৩৫৪-২২২২৩৫৯ |
| ৩২) | আলিপুরদুয়ার ৭৩৬ ১২১ | ঃ | সুভাষ পল্লী, বাস টার্মিনাসের বিপরীতে, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২২৫১২৮৪ |
| ৩৩) | গ্যাংটক ৭৩৭ ১০৭ | ঃ | সিকিম, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, ফোন ঃ ০৩৫৯২-২০৪৯০১, ৯৪৩৪০২৪৯০১ |
| ৩৪) | গুয়াহাটি ৭৮১ ০৩২ | ঃ | "বিশ্বশান্তি ভবন", ১, বাই লেন, রূপনগর, ফোন ঃ ০৩৬১-২৪৬০২৯৭/৩০০ |
| ৩৫) | তিনসুকিয়া ৭৮৬ ১২৫ | ঃ | "ব্রহ্মাণ্ড ভবন", এস.বি.আই. কলোনী, মানব কল্যাণ ট্রাস্ট এর বিপরীতে, ফোন ঃ ২৩৩৯১১৩ |
| ৩৬) | আগরতলা ৭৯৯ ০০১ | ঃ | বোধজং গার্লস এইচ.এস. স্কুল, মধ্য বনমালীপুর, ফোন ঃ ০৩৮১-২৩২২৪২২ |
| ৩৭) | বাংলাদেশ | ঃ | দ্য এ্যাকাডেমী ফর্ এ বেটার ওর্য়াল্ড, ভোলানন্দ গিরি ট্রাস্ট কমপ্লেক্স ১২, কে.এম. দাস লেন (৪র্থ তল), সেন্ট্রাল ওম্যান্স কলেজের বিপরীতে, টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩ |

**সারা বিশ্বে ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেবা ৯০০০ এর বেশি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রসারিত।**

Website : www.brahmakumaris.com

# गीता ज्ञान कब क्यों और किसके द्वारा दिया गया?

# GITA KNOWLEDGE – WHEN, WHY & BY WHOM?

FEARLESSNESS
निर्भयता
अन्तर्मुखता
INTROVERTNESS
PATIENCE
धैर्यता
HUMILITY
नम्रता
PURITY
पवित्रता
SWEETNESS
मधुरता
सहनशीलता
TOLERANCE
हर्षितमुखता
CHEERFULNESS
कमल पुष्प समान पवित्र बनो
दिव्य गुण
DIVINE VIRTUES